জুলাই ১৯৮৯

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : অর্কিড

লিখেছেন : মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

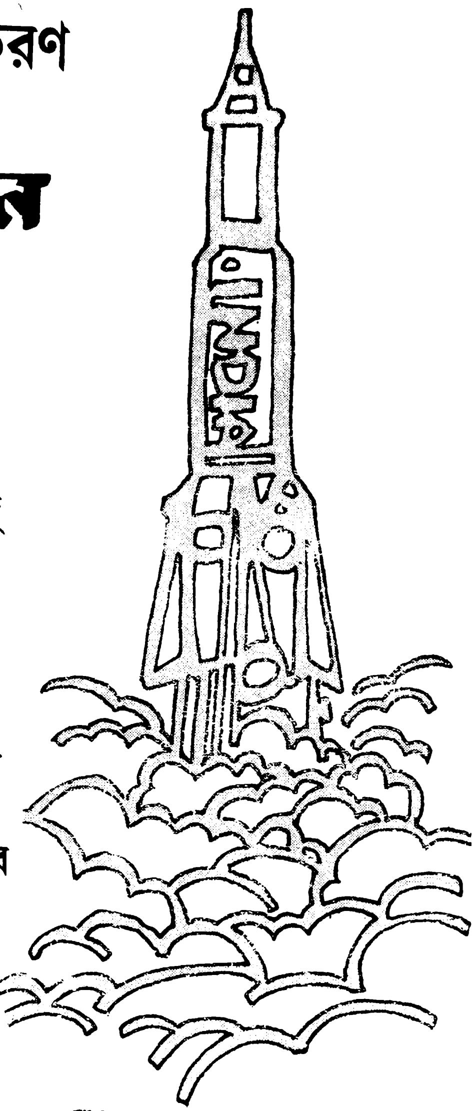

উপন্যাস ও গল্প লিখবেন

লীলা মজুমদার ৷৷ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৷৷ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৷৷ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৷৷ অদ্রীশ বর্ধন ৷৷ নিরঞ্জন সিংহ ৷৷ কিন্নর রায় ৷৷ সমরজিৎ কর ও অনেকে ।

বিশেষ প্রবন্ধগুচ্ছ : স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি—লিখবেন

জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৷৷সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্র ৷৷ জয়ন্ত বসু ৷৷ রমাতোষ সরকার ৷৷ বিমান বসু ৷৷ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনেকে

শ্রীপান্থ রচিত রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

ছড়া ও কবিতা লিখবেন

অন্নদাশঙ্কর রায় ৷৷ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৷৷ কৃষ্ণ ধর ৷৷ অমিতাভ চৌধুরী ও অনেকে

সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ

কম খরচের দশটি অভিনব মডেল

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

বেরুবে পুজোর আগেই

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও

যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

নবম বর্ষ 4র্থ সংখ্যা
জুলাই 1989

সূচীপত্র

চিঠিপত্র : 4
কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর : পদার্থ থেকে শক্তি ॥ সমরজিৎ কর 7
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : অর্কিড ॥ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ 19
পড়াশোনা : গণিতের রত্নভাণ্ডার থেকে ॥ নন্দলাল মাইতি 17 : আইসোটোপ ॥ সমীরকুমার ঘোষ 15 : নিষ্ক্রিয় মৌল-হিলিয়াম ॥ ষষ্ঠীপদ কবিরাজ 51 : শ্বসন : কয়েকটি প্রশ্নোত্তর ॥ তপন ধাড়া 37
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : ফেরোমনের কারসাজি ॥ নারায়ণ দাস 34
জীবজন্তু : ডলফিন ॥ অমিত ভট্টাচার্য 30 : প্রাণী জগতের বিচিত্র ঘটনা ॥ সিদ্ধার্থ কর্মকার 22
স্মরণ : একটি নমস্কারে ॥ কিন্নর রায় 11
শরীর-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা : ঘুম রহস্য ॥ কেশবচন্দ্র প্রধান 40
গাছপালা : একটি বীজের আত্মকথা ॥ তপন দোলুই 29 : উন্নত প্রজাতি ও দ্রুত ফল সৃষ্টিতে কলমের ব্যবহার : জনি সরকার 39
নিজে নিজে কর : মডেল বানাতে গিয়ে ॥ রাজেশ গিরি 53 : মডেল-এর রকমফের ॥ নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র 54 : ইলেকট্রনিক গেম ॥ দীপেন ভট্টাচার্য 64 : হিমায়ন যন্ত্র ॥ সৌমেন বিশ্বাস 65
সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট : মজার এক্সপেরিমেন্ট ॥ পীযুষ কান্তি ভুঁড়ে 59
ফিচার ও ছবিতে গল্প : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 55 ॥ কুইজ কনটেস্ট 56 : আবিষ্কারের গপ্প ॥ অলয় ঘোষাল 57 : শব্দকূট ॥ মিনজাজ উদ্দিন 58 : আই-কিউ-টেস্ট 58 : বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সমাধান 58 : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 : উভচর মানব ॥ গৌতম কর্মকার 43
কারিগরি ও প্রযুক্তি : ফ্যাক্স বিপ্লব ॥ সিদ্ধার্থ রায় 47
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : বিজ্ঞানের খবর ॥ সিদ্ধার্থ সরকার 52 : সাইকেল কিভাবে এল ॥ জহর মুখোপাধ্যায় 27 : ধূমকেতু তত্ত্বে ও তথ্যে ॥ শচীনন্দন আঢ্য 41 : লালরঙ জলের নিচে ॥ দেবাশিস বসু 42 : বিজ্ঞানের টুকিটাকি ॥ মানস কুমার চিনি 50
বিতর্ক : একটি কোণকে যে কোন সংখ্যক সমান কোণে বিভক্ত করা কি সম্ভব ? ॥ তপন ভট্টাচার্য 9
ধারাবাহিক রচনা : বোর্ণিওর বেরী ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 31
কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : পরিষদের খবর 63 : উত্তর দাতাদের নাম 63 : বলতে পারো কেন ॥ সুধাংশু পাত্র 60 : বিজ্ঞান সংবাদ 66 : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকা 18

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মাছের রোগ

লিখবেন

দেবাশীষ কর

প্রধান সম্পাদক : **সমরজিৎ কর**
সম্পাদক : **রবীন বল**
সহ সম্পাদক : **জয়ন্ত দত্ত**

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, P-21, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-6 থেকে মুদ্রিত। দাম : 5·00 টাকা **প্রচ্ছদ :** নিমাই নন্দী

পড়াশোনা

মে '89 এর 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত গাণিতিক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দু একটি কথা বলার আছে।

প্রথমতঃ, আমার সূত্রগুলি যে নূতন ধর্মের পর্যায়ভুক্ত নয় সে বিষয়ে অনিরুদ্ধ বাবুর সঙ্গে আমিও একমত। বস্তুত প্রবন্ধটি যখন লিখি তখন আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র (এ বছর আমি মাধ্যমিক দিয়েছি) ফলে ধর্মটিকে আমার কাছে স্বভাবতই নূতন মনে হয়। তবে পরবর্তী সময়ে (প্রবন্ধটি ততদিনে দপ্তরে জমা পড়ে গেছে) উচ্চমাধ্যমিকের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে দেখলাম এই সূত্রদ্বয় আসলে Sire Rule এরই অনু সিদ্ধান্ত মাত্র। তবে ২য় সূত্রটির গুরুত্ব যে একেবারেই নেই তা কিন্তু আমার মনে হয় না। কারণ, ত্রিকোণমিতিতে সূত্রটিকে সরাসরি প্রায়োপযোগী সূত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয় না। তাছাড়া ত্রিভুজ সংক্রান্ত আলোচনাতেই সূত্রটির তাৎপর্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু বৃত্তবিষয়ক আলোচনায় এর সরাসরি প্রয়োগ অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে হয়। বিশেষতঃ এই সূত্রের কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত বৃত্ত সংক্রান্ত পরিমিতির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চাপের দৈর্ঘ্য এবং বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে সহজ করে তুলতে পারে।

কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ $=r$, বৃত্তটির কোন চাপের দৈর্ঘ্য $=l$, ঐ চাপের প্রান্তদ্বয়ের সংযোজক জ্যা এর দৈর্ঘ্য $=x$, চাপ কর্তৃক পরিধিতে উৎপন্ন কোণের মান $=\theta$ রেডিয়াল এবং উক্ত চাপ ও জ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল $=A$ হলে,

(i) $x = \dfrac{l \text{Sin}\theta}{\theta}$, (ii) $l = \dfrac{x\theta}{\text{Sin}\theta}$, (iii) $x = 2r\text{Sin}\, l/2r$

(iv) $A = r^2 (\theta - \text{Sin}\theta \cos\theta) = \frac{1}{2}r^2 (2\theta - \text{Sin}2\theta)$ [স্থানাভাবে প্রমাণ দিলাম না] এর মধ্যে (i) ও (ii) এর দ্বারা বৃত্তের ব্যাসার্ধ না জেনেও চাপ বা জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্ভবপর। (iv) এর সূত্রটিও বৃত্তাংশেয় ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে দ্রুততা আনবে বলে মনে হয়।

যাই হোক, $R = \frac{1}{2}C \,\text{Cosec}\theta$ সূত্রটি নূতন আবিষ্কার না হলেও এটিকে বৃত্তের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বোধহয় কিছুটা নূতনত্বের দাবী করতে পারে। সূত্রটি প্রয়োগ না করেও সাধারণ জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির সাহায্যে সমস্যার সমাধান অবশ্যই সম্ভবপর, তবে যেসব ক্ষেত্রে সূত্রটির প্রয়োগ যান্ত্রিকভাবে (ছবি না এঁকে) এবং অনায়াসে সমাধান করতে সহায়ক, সেক্ষেত্রে সূত্রটির প্রয়োগই কি বাঞ্ছনীয় নয়? প্রসঙ্গত ঃ বলি, r ও θ প্রদত্ত থাকলে x নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূত্রটি ব্যবহার না ক'রে অনিরুদ্ধবাবু যে পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে কিন্তু অযথা কিছু বাড়তি সময় ব্যয়িত হচ্ছে। বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত প্রশ্নেও উপরোক্ত (iv) নং সূত্র অন্যান্য উপায় অপেক্ষা দ্রুততর সমাধানে সক্ষম। সাধারণ ত্রিকোণমিতির দ্বারা সমাধান করা যাবে বলেই সূত্র প্রয়োগ নিস্প্রয়োজন—এই যদি সূত্রপ্রয়োগে অনীহার একমাত্র কারণ হয়, তবে তো যোগ ছাড়া অন্য কোন পাটীগাণিতিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হোত না, যেহেতু যোগ দ্বারাই অপর তিনটি প্রক্রিয়ার কাজ চালানো সম্ভব।

দেবাশীষ গোস্বামী, 4/1, বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড, বারাসত, নর্থ ২৪ পরগনা

মানিপ্ল্যাণ্ট

এত এপ্রিল '89 সংখ্যার একটি লেখা "মানি প্লান্টের জীবন ধারণ" সম্বন্ধে কমল কুমার মৈত্র-র মত এর সঙ্গে আমার মতের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলাম। কমল বাবু লিখেছেন যে মানি প্লান্টের একটি পাতা শুকিয়ে গেলে তবেই একটি পাতা বের হয়। আমাদের বাড়িতে প্রচুর মানি প্লান্টের গাছ আছে তাতে দেখলাম কাক্ষিক মুকুল থেকে বেশ কয়েকটি কচি পাতা বেরিয়েছে যেখানে শুকনো পাতার সংখ্যা মাত্র দুটি। তাই আমার মতে—মানি প্লান্টের বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হয়।

মানব ব্যানার্জী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

পড়াশোনা

1989 সালের এপ্রিল মাসের পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগের পড়াশোনা-তে মাননীয় মোঃ ওমর আহমেদ লিখেছেন ম্যাগনেসিয়ামের একটি সংকর ধাতু হল 'ম্যাগনেসিয়াম' এবং উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে জলীয়বাষ্পের বিক্রিয়ায় MgO ও H_2 উৎপন্ন হয়। কিন্তু সংকর ধাতুটি হল 'ম্যাগনেলিয়াম' এবং উত্তপ্ত Mg-এর সঙ্গে জলীয়বাষ্প অথবা গরম জলের বিক্রিয়ায় MgO ও H_2 উৎপন্ন হয়।

1989 এপ্রিল মাসের পত্রিকায় পড়াশোনা বিভাগে মাননীয় সমীর কুমার ঘোষ-এর প্রবন্ধে Edison বাতির আরো অসুবিধা হল—ইহার আলো হলুদ ধরনের। এই আলো সর্বদা কাঁপে। আর্গন নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলেও নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয়। ফ্লুরোসেণ্ট বাতি নয়, এটা হবে ফ্লুরেসেণ্ট বাতি। এই বাতি তৈরীর সময় নলের বায়ু চাপ না কমালে পারদ বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ হয় না।

তরুণ কুমার বেরা, পূর্বাশা ক্লাব, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

অঙ্ককষার সূত্র

গত এপ্রিল '89 সংখ্যায় নিখিল রঞ্জন বালা 'অঙ্ককষা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে সূত্রটির অবতারণা করেছেন সেই সূত্রটি ওঁর আবিষ্কৃত বলে দাবি করেছেন। কিন্তু ঐ সূত্রটি ওঁর আবিষ্কৃত নয়।

আমি বি. কম (অনার্স)-এর ছাত্র। আমাদের 'Statistics'-এর 'Measures of central Tendency'-র বিবর্ত যৌগিক গড় বা Harmonic Mean (H. M.)-এর অঙ্কগুলো $\frac{2}{\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_2}}$ বা $\frac{2x_1x_2}{x_1+x_2}$ সূত্র দিয়ে করা হয়ে থাকে।

(প্রসঙ্গ ক্রমে বলে রাখি, নিখিল রঞ্জনের v_1 ও v_2 এখানে x_1 ও x_2)

যদি কোন গড় (average) করতে দেওয়া অঙ্কে দুইটি বিষয় থাকে এবং তাদের মধ্যে একটি যদি স্থির থাকে তবেই এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ধরি, কোন একজন কমলালেবু বিক্রেতা প্রথমে 1 টাকায় 2টি কমলালেবু এবং পরে 1 টাকায় 3টি কমলালেবু বিক্রয় করে। তবে সে এক টাকায় কয়টি কমলালেবু বিক্রয় করিল ?

উত্তর :— $\frac{2\times2\times3}{2+2}=2\cdot4$টি কমলালেবু 1 টাকায় গড়ে বিক্রয় করে।

(এখানে $x_1=2, x_2=3$)

অপরপক্ষে,

উপরোক্ত উদাহরণের পরে কমলালেবু বিক্রেতা যদি আবার 1 টাকায় 5টি এবং পরক্ষণেই 1 টাকায় 6টি লেবু বিক্রয় করে তবে সে কয়টি কমলালেবু গড়ে 1 টাকায় বিক্রয় করিল তা বের করব এইভাবে :

উত্তর :— $\frac{4\times2\times3\times5\times6}{2+3+5+6}=45$ (এখানে $x_1=2, x_2=3, x_3=5, x_4=6$)

যা কিনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সুতরাং বোঝা যায় দুই-এর বেশি variable-এর ক্ষেত্রে এই সূত্র খাটে না। কিন্তু এই সূত্রের আসল উৎস $\frac{2}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}}$ বা $\frac{4}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}+\frac{1}{x_4}}$ —এর মাধ্যমে করলে সঠিক উত্তর আসে। উপরের উদাহরণ অনুযায়ী হয়,

$\frac{4}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}}=3\cdot33$টি কমলালেবু গড়ে 1 টাকায় কমলালেবু বিক্রেতা বিক্রয় করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নিখিল রঞ্জনের দেওয়া সূত্রটি শুধুমাত্র দুটি variable-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তার বেশি variable-এর ক্ষেত্রে নয়।

সুব্রত চৌধুরী C/o বি. সি. চৌধুরী 138, কে. সি. রোড
পোস্ট নৈহাটী, নর্থ ২৪ পরগনা

সাপ ও দুধ

"কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান জানুয়ারী 1989 সংখ্যায় ''চিঠিপত্র'' বিভাগে অভিষেক দাস জানতে চেয়েছে "সাপ দুধ খায় কিনা।"

তার স্কুলের শিক্ষক মহাশয় কি হিসাবে "কোন কোন সাপ দুধ খায়" একথা বলেছেন তা আমি জানি না। সাপ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে তবুও এই সামান্য তথ্যটুকু পাঠক বর্গকে উপকৃত করবে।

যা সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন তাঁদের কাছ থেকে এবং বিভিন্ন ভাবে জেনেছি যে, সাপ মোটেই দুধ খায় না। সাপ মাংসাসী। সাপ মাছ, ইঁদুর, ব্যাঙ, পাখির ছানা প্রভৃতি খায়। দুধ কলা খায় না। বেদেরা সাপের খেলা দেখিয়ে সাপকে দুধকলা খাওয়ানোর জন্য যে পয়সা আদায় করে তা সাপকে দুধকলা দেয় নিজেদেরই পেট ভরানোর জন্য।

গ্রামাঞ্চলে গোরুর বাঁট থেকে কিছু সাপ দুধ খেয়ে নেয় এটি মানুষের অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। থোলাপুর জেলার শ্বেতপাল গ্রামে প্রতিটি পরিবারে একটি করে গোখরো সাপ পোষেন। কিন্তু তাদের কাছেও শুনিনি যে সাপ দুধ কলা খায়।

কিন্তু সাপ যখন ভীষণ ক্ষুধার্ত হয় তখন সে দুধ ও অন্যান্য কিছুও খায়।

মানুষ যখন খাবার কোথাও না পেয়ে ভীষণ ক্ষুধার্ত হয় তখন তাকে বনের লতাপাতা সিদ্ধ করে খেতে দেখা যায়, তবে কি আমরা বলব ? মানুষের খাদ্য লতাপাতা !

একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, "ফাঁদে পড়লে বাঘেও ধান খায়" হয়তো ফাঁদে পড়লে বাঘে ধান খেয়ে থাকে।

সোমনাথ হাইত, পলাশি পাড়া, নদীয়া।

উষ্ণতা ও পরিমাপ

লেখকের বক্তব্য

'উষ্ণতা ও তার পরিমাপ' শীর্ষক আমার লেখার উপর ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে প্রকাশিত কয়েকটি চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই যে, পারদ থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরাঙ্ক—39°C ই হবে (39°C নয়)। এরকম ছোট-খাটো মুদ্রণ প্রমাদের ওপর লেখকদের যে কোনো হাত থাকে না, আশাকরি পাঠকের সে কথা স্বীকার করবেন। যদিও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় একটা ঋণাত্মক চিহ্ন যদি মুদ্রণপ্রমাদে বাদ যায়, তার ফল হয় ভয়াবহ, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্য প্রসঙ্গে জানাই যে, পারদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে পারদের উচ্চস্থিরাঙ্ক 357°C (যা সব পাঠ্য-পুস্তকে লেখা থাকে)। ঐ উষ্ণতায় পারদ ফুটতে থাকে। সেজন্য থার্মো-মিটার (পারদ) ব্যবহারের সময়ে ঐ তাপমাত্রা পর্যন্ত পারদ থার্মোমিটার ব্যবহার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, 350°C-এর বেশি তাপমাত্রা মাপের ক্ষেত্রে, পারদ থার্মোমিটার ব্যবহারযোগ্য নয়। সেজন্যই পারদ থার্মোমিটারের পাল্লার ক্ষেত্রে 350°C বলা হয়েছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিদেশী বইতে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। অ্যালকোহল থার্মোমিটারের পাল্লার ক্ষেত্রেও উল্লেখিত উচ্চসীমার বেলায় একই যুক্তি প্রযোজ্য।

আর রচনায় উল্লেখিত সেলসিয়াসের স্কেল আবিষ্কারের সঠিক বৎসরের প্রসঙ্গে জানাই যে, সেলসিয়াস 1741 সনের শেষদিকে এ স্কেল আবিষ্কার করেন এবং সেটি সর্বসময়ে প্রকাশ করেন কয়েক মাস পরে 1742-এর প্রথমদিকেই। সেজন্য অনেকেই এ' আবিষ্কারের বছর 1741 ও বলেন আবার কেউ কেউ 1742 ও বলেন। আসলে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কখনো হঠাৎ একসময়ে ঘটে না। তার পিছনে সময়ের একটা ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি থাকেই। আর পুরানো এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একেবারে সাধক ও নির্ভুল সন্ বা সাল নির্দেশ করা খুবই কঠিন। 2/1 বছরের হেরফের সব সময়েই হয়ে যেতে পারে। কারণ এ সবের কোনো সঠিক ও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দলিল, থাকে না। আর সেজন্যই, 2/1 বছরের হেরফের ঐ সব আবিষ্কারের মূল্যের কাছে গণ্যই নয়।

তবুও সজাগ ও সচেতন কতিপয় পাঠক যে এ সব সামান্য ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করেছেন ও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটা দেখে খুব ভাল লাগছে এবং সেজন্য এঁদের ধন্যবাদ জানাই।

সমীর কুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্যারিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

লেখকের বক্তব্য

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে 'পড়াশোনা' বিভাগে প্রেরিত আমার একটি পত্রে অন্যমনস্কতা বশত কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। ত্রুটিগুলি নিম্নে উল্লেখ করছি।

1. '$\sum$' (Sigma) কথাটির অর্থ Sum বা Summation

2. $\sum_{i=1}^{n} xi = 1+2 \cdots + n$ হবে না

$\sum_{i=1}^{n} i = 1-2+3+ \ldots + n$ হবে।

3. $\sum_{i=1}^{n} 2xi = 2\times 1 + 2\times 2 + \ldots \ldots + 2\times n$ হবে না।

$\sum_{i=1}^{n} 2i = 2\times 1 + 2\times 2 + \cdots 2\times n$ হবে।

4. বহুভুজের কর্ণসংখ্যার formula হবে

$\sum_{i=2}^{n-2} i$ [যেখানে n = বাহুসংখ্যা]

আশাকরি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি ক্ষমা করে দেবেন।

কৌস্তুভ গোস্বামী, সেন্ট জেভিয়াস' স্কুল, কলিকাতা

কোমোডো ড্রাগন

গত 1989 ফেব্রুয়ারি'র কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় সঞ্জয় সরকারের কোমোডো ড্রাগন কি ও কোথায় থাকে? এর সম্বন্ধে আর কিছু না বললে উত্তরটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন 500 লক্ষ বছর আগে অস্ট্রেলিয়াতে এরকম প্রাণী ছিল যার কঙ্কাল তারা পেয়েছেন। এরা আসলে নাকি মাঁনট্র লিজার্ড জাতের জন্তু। 1961 সালে ইন্দোনেশীয় বিজ্ঞানীরা দেখেন শুধু কোমোডো নয়; কোমোডো সংলগ্ন আরও চারটি দ্বীপে এই প্রাণীরা রয়েছে। এই ড্রাগনরা কয়েকমিনিটের মধ্যে আশি কিলো মাংস শেষ করে দিতে পারে। এরা গাছে উঠে বাঁদরদেরও ধরে খায়। এরা ভাল সাঁতরাতেও পারে যায় ফলে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এসেছে। বিজ্ঞানীরা আরোও বলেন মাংসাশী প্রাণী হিসাবে এদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং এদের খাদ্যেরও কোন অভাব ঘটেনি যার ফলে ডাইনোসরের সমকালীন জীবটি আজও বেঁচে আছে।

বিবেক জ্যোতি ঘোষ, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

পদার্থ থেকে শক্তি

সমরজিৎ কর

যদি প্রশ্ন করি, বল তো কাদের আমরা মৌলিক পদার্থ বলি? জানি, প্রশ্নটি শুনে সবাই তোমরা সোচ্চার হয়ে উঠবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেঃ কেন? সে তো অনেক। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অকসিজেন, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রূপো—। গড় গড় করে বলে যাবে আরো কত মৌলিক পদার্থের নাম।

যদি প্রশ্ন করি, তা হলে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা মোট কত দাঁড়াল?

এ প্রশ্নেরও উত্তর অনেকের জানা। বলবে বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

তা হলে আর একটি প্রশ্নও করিঃ তা মৌলিক পদার্থ না হয় বিরানব্বুইটি হল। কিন্তু তারা কী দিয়ে তৈরি বলতে পারো?

এ প্রশ্নটি শোনার পর কেউ কেউ হয়ত মুখ চাওয়াচায়ি করবে। তবে কারোর কারোর কাছে এ প্রশ্নটিরও যে উত্তর জানা, তাও জানি। কারণ, অনেকেই জান, বিজ্ঞানীরা বিরানব্বুই রকমের মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করলেও, একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি সব মৌলিক পদার্থই তিনটি কণা দিয়ে তৈরি। কণা তিনটি হল, ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেকট্রন সবচেয়ে হাল্কা কণা। স্থির অবস্থায় যার ভর $9 \cdot 107 \times 10^{-28}$ গ্রাম। অথবা বলা যায়, প্রোটনের ভরের $1/1837$ গুণ। অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের ভরের 1837 ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইলেকট্রনের মধ্যে থাকে নিগেটিভ বিদ্যুৎ আধান। প্রোটনের ভর $1 \cdot 62 \times 10^{-24}$ গ্রাম। প্রোটনে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান। নিউট্রনের ভরও প্রোটনের ভরেরই প্রায় সমান। তবে নিউট্রনে কোন তড়িৎ আধান থাকে না।

বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থের পরমাণুর চেহারাটা সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করেন। সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে যেমন রয়েছে সূর্য, তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রেও থাকে একটি অংশ। এই অংশটিকে বলা হয় নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন কণা মাত্র, নিউট্রন নেই। এ ছাড়া বাকি সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসেই থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটনে পজিটিভ বিদ্যুৎ আধান থাকে। তাই নিউক্লিয়াসও হয়ে দাঁড়ায় পজিটিভ বিদ্যুৎ ধর্মী কণার মত। নিউক্লিয়াসের চারপাশে আঁকাবাঁকা পথে প্রচণ্ড গতিতে পরিক্রমণ করে ইলেকট্রন কণাগুলি। যেমন সূর্যের চারপাশে পরিক্রমণ করে বিভিন্ন গ্রহ।

আরো একটি কথা আছে। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে, তার চার পাশে পরিক্রমণ করে ঠিক ততগুলিই ইলেকট্রন। যেমন হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন, তাই তার চার পাশে পরিক্রমণ করে একটি মাত্র ইলেকট্রন। যেমন, অক্সিজেনের নিউক্লিয়াসে থাকে আটটি প্রোটন, তাই তার চারপাশে পরিক্রমণ করে আটটি ইলেকট্রন। ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হল, সৃষ্টির গোড়ায় ব্যাপারটা কিন্তু ছিল অন্যরকম। তখন এখনকার মত কোন মৌলিক পদার্থই ছিল না। ছিল শক্তি। শক্তি থেকে সৃষ্ট হল বস্তু কণা—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আরো নানা রকম কণা। তারপর সৃষ্টি হল প্রথম মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন। সেই সময় অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দশ'শ থেকে পনের'শ কোটি বছর আগে ব্রহ্মাণ্ডের চেহারাটি ছিল এই রকমঃ শুধু গ্যাস আর গ্যাস। হাইড্রোজেন, কিছুটা হিলিয়ামের গ্যাস। সেই গ্যাসের মধ্যে মিশে রয়েছে নানা রকম পারমাণবিক কণা। সেই গ্যাস স্থানে স্থানে পুঞ্জিভূত হল—শত সহস্র কোটি বছর ধরে। তৈরি হল নক্ষত্র। যাদের মূল উপাদান বলতে হাইড্রোজেন।

এই মাত্র বললাম, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন, আর তার চারপাশে পরিক্রমণ করে একটি ইলেকট্রন। এখন, ব্যাপার দাঁড়াল এই, নক্ষত্রের তাপ মাত্রা প্রচণ্ড বেশি। বাইরের তলের কথা বাদ দিলে তার ভেতরে তাপমাত্রা লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এখন প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভেতর থেকে ইলেকট্রন কণা ছিটকে বেরিয়ে যায়। পড়ে থাকে তার নিউক্লিয়াস। এ ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বলতে বোঝায় শুধু প্রোটন কণা। এমন অবস্থায় ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম; প্রোটন পজিটিভ বিদ্যুৎ ধর্মী কণা। সাধারণ তাপমাত্রায় একই তড়িৎধর্মী কণারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তাই, এ ক্ষেত্রে পজিটিভ

প্রোটন কণারা কেউ কারোর সংস্পর্শে আসতে পারে না। একমাত্র পজিটিভ এবং নেগেটিভ কণা পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি সূত্র তৈরি করেন চার্লস অগাস্টিন কুলম্ব নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী। যার নাম 'কুলম্বের সূত্র'। এই সূত্র অনুযায়ী প্রোটন কণারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসতে পারে না। এই না পারাটাকে বলা হয় 'কুলম্ব ব্যারিয়ার' বা কুলম্বের বাধা। কিন্তু নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড পরিমাণ তাপশক্তি থাকায় কুলম্বের এই বাধাটি অচল হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড পরিমাণ উত্তাপ শক্তি পেয়ে প্রোটন কণাগুলির গতি শক্তি দারুন ভাবে বেড়ে যায়। তখন তারা কুলম্বের বাধা অতিক্রম করে পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে। দুটি কাদার ড্যালা যেমন পরস্পরের গায়ে ধাক্কা মারলে মিশে গিয়ে একটি ড্যালায় পরিণত হয়, এ ক্ষেত্রেও এখন ব্যাপারটা ঘটে সেই রকম। দুটি প্রোটন কণা অর্থাৎ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস পরস্পর মিশে গিয়ে তৈরি করে নতুন একটি নিউক্লিয়াস। যাকে বলা চলে নতুন পদার্থের নিউক্লিয়াস। এ ধরনের ঘটনাকে বলা হয় পারমাণবিক সংযোজন বা থার্মোনিউক্লিয়ার ফিউশন। এই নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন। নিউট্রন কণাটি তৈরি হয় পারমাণবিক বিক্রিয়ার দরুণ। আর এই নিউক্লিয়াসটিকে বলা হয় 'ডয়েটেরন'। এমন অবস্থায় একটি ইলেকট্রন কণা এসে তার চারপাশে পরিক্রমণ শুরু করলে তৈরী হয় নতুন ধরনের একটি পরমাণু। যার নাম ডয়েটেরিয়াম (D)। আমরা যাকে ভারী জল বলি সেটা এই ডয়েটেরিয়ামেরই অকসাইড (D_2O)। যেমন সাধারণ জলকে বলা হয় হাইড্রোজেনের অকসাইড (H_2O)।

এখানে আর একটি মজার ঘটনা ঘটে। তোমরা জান, পদার্থকে ধ্বংস করা যায় না। অথচ দুটি প্রোটন কণা সংযোজিত হয়ে যখন একটি 'ডয়েটেরন' তৈরি করে তখন দেখা যায় এই ডয়েটেরনের ভর কিছুটা কমে গেছে। এবং একই ভাবে ওই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের চারটে নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ নতুন একটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস—হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তখন নির্গত হয় প্রচুর পরিমাণ তাপ শক্তি। নক্ষত্রের বয়েস বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে এই পদ্ধতিটি সমান ভাবে চলতে থাকে। এক সময় হাইড্রোজেন হয়ে পড়ে প্রায় শেষ। তখন হিলিয়াম নিউক্লিয়াসই হয়ে দাঁড়ায় নক্ষত্রের প্রায় প্রধান বস্তু। এর পর হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়। সৃষ্টি করে অকসিজেনের নিউক্লিয়াস। আরো কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসও। শেষ পর্যন্ত সমস্ত মৌলিক পদার্থ—ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। বলতে পারো, সংক্ষেপে এই হল মৌলিক পদার্থগুলির জন্মবৃত্তান্ত। আর জন্মের সময় পারমাণবিক সংযোজন চলাকালে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি—নক্ষত্রগুলিতে। সূর্যও একটি নক্ষত্র। সেখানেও চলে এই কাণ্ড। বলতে কি, এই সংযোজন পদ্ধতিতেই সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে অফুরন্ত শক্তি।

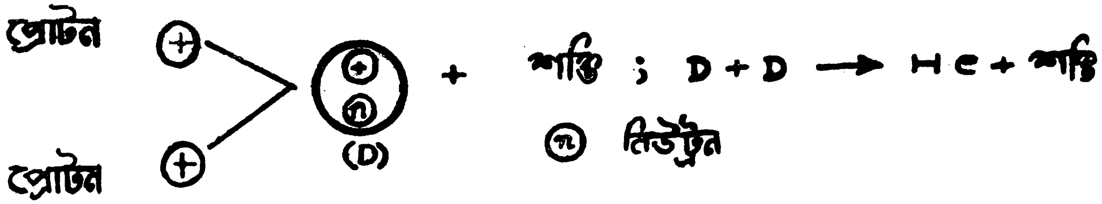

2টি প্রোটন বা হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস পারমাণবিক সংযোজন ঘটে সৃষ্টি করে একটি ডয়েটেরন-এর নিউক্লিয়াস (D) এবং শক্তি
দুটি D সংযোজনের পর তৈরি হয় একটি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস (He)। এটা পারমাণবিক বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ।

ঘোষণা

নিউজপ্রিণ্ট এর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য আগামী আগস্ট '89 সংখ্যা থেকে অনোন্যপায় হয়ে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার দাম 50 পয়সা বৃদ্ধি করতে হবে। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আশা করি আমাদের সঙ্গে আগের মতোই সহযোগিতা করবেন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার

একটি কোণকে যে কোন সংখ্যক সমান কোণে বিভক্ত করা কি সম্ভব ?

তপন ভট্টাচার্য

কোন কোণকে কেবল সমান তিনটি কোণেই নয়, যে কোন সংখ্যক সমান কোণেও বিভক্ত করা যায়। (চাঁদার সাহায্য ছাড়া, কেবল রুলার, কম্পাস এবং পেন্সিল দিয়ে।)

∠ABC একটি কোণ। একে সমান তিনটি কোণে বিভক্ত করতে হবে।

পদ্ধতি :—একটি যে কোন ব্যাসার্ধ নিয়ে B বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তচাপ আঁকা হল যা BA এবং BC বাহুকে যথাক্রমে E এবং F বিন্দুতে ছেদ করল। E ও F যোগ করা হল। EF বাহুকে, (অষ্টম শ্রেণীর 2নং সম্পাদ্য অনুযায়ী) FX, XY ও YE সমান তিনটি বাহুতে বিভক্ত করা হল। BX এবং BY যুক্ত করা হল।

∴ ∠ABC কোনটি ∠ABY, ∠YBX ও ∠XBF-এই তিনটি সমান কোণে বিভক্ত হল।

বুঝবার সুবিধার জন্য ∠ABC কোণকে 60° কোণ করে এঁকে নিয়েছি। পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ∠ABY, ∠YBX ও ∠XBF কোণত্রয় সমান এবং প্রত্যেকের মান 20°।

এই পদ্ধতিতে উক্ত কোণকে n-সংখ্যক সমান কোণে

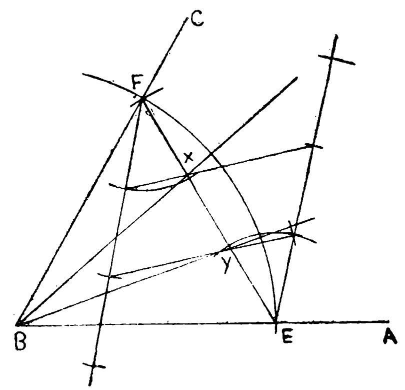

বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে EF বাহুকে n-সংখ্যক সমান বাহুতে বিভক্ত করতে হবে।

পশ্চিম পাড়া, অর্জুনপুর, কল-59।

বিতর্ক

বিতর্কের পাতা—কিশোর মনের বিচিত্র ভাবনা চিন্তার প্রতিফলন।

যুক্তিগ্রাহ্য যে কোন বিজ্ঞান রচনা বিতর্ক বিভাগে

আলোচনার জন্য পাঠানো যেতে পারে।

খাদ্যে স্বয়ংম্ভরতা অর্জন। উৎপাদন তিনগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।
প্রতি ৪টি গ্রামের মধ্যে তিনটিতে বিদ্যুত পৌঁছে গেছে।
সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে।
BANK
সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জনগনের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যসূচী
অনেকটা পথ আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি
গত পাঁচ বছরে ১০ কোটিরও বেশী জনগনকে দরিদ্র সীমার ওপরে নিয়ে আসা হয়েছে।
স্মল পক্স, প্লেগ নির্মূল করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থায় উল্লেখজনক উন্নতি ঘটেছে।
সুস্বাস্থ্য - দীর্ঘ জীবন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং তাতে ভর্তির হার ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমশই অধিক সংখ্যক জনগন লিখতে এবং পড়তে শিখছেন।
ভারত এখন বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম একটি দেশ - আমাদের শিল্পোৎপাদন বছরে ৯ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে।
আমাদের প্রগতিতে আমরা গর্বিত।
davp 89/61 Ben

একটি নমস্কারে

কিন্নর রায়

দেখতে দেখতে একটি বছর ঘুরে গেল। পৃথিবীতে তেমনই আলো এবং ছায়ার খেলা। বাতাসে' ঋতু বদলের গন্ধ। তবু সেই মানুষটি নেই। কিংবা হয়ত আরও অনেক বেশি বেশি করে ছড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে আছেন আমাদের। নইলে কেন এই স্মৃতিচারণার আয়োজন?

স্মৃতির কুলঙ্গী থেকে কোনো বড় ব্যক্তিত্বের ছবিটি নামিয়ে যখন ঝাড়পোঁছ করি, স্মরণ করি তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই যে অকিঞ্চিৎকর 'আমি'—তারও কিছু প্রসঙ্গ এসে যায় হয়ত। এ নিছকই 'আই প্রোজেকশান' নয়। লিখতে গিয়ে যদি কোনো বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, পাঠক ক্ষমা করবেন।

কোন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আমরা ধরব? 'সাগর থেকে ফেরা' 'বেনামী বন্দর', আর 'আমি কবি যত মজুরের'—সেই প্রেমেন্দ্র মিত্রকে? নাকি 'মহানগর', 'স্টোভ', 'পুন্নাম' শুধু কেরানী, 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে-র মতো অজস্র দিগ্বিজয়ী ছোট গল্পের লেখককে? নাকি তিনি ঘনাদা, পরাশর, মামাবাবু, মেজোকর্তার স্রষ্টা আর অজস্র ছোটদের গল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন কল্প বিজ্ঞান, ছড়া কবিতার লেখক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আমাদের কাছে?

ছিলেন গীতিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য লেখক, ঔপন্যাসিক। তবে তাঁর উপন্যাস সে অর্থে জমেনি। যেমন জমেছিল অন্যান্য লেখাগুলি। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়েই তিনি সম্পূর্ণ নন। সব মিলিয়েই তিনি, প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ও'র সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত সত্তর দশকের মাঝামাঝি। তখন বালিতে থাকি। ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের কিছু আগে বেলুড় থেকে সরল দের সম্পাদনায় পর্ণপুট নামে একটি পরিচ্ছন্ন কাগজ বেরিয়েছিল। তার কবিতা আনতে গেছিলাম প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ি। সরল দের চিঠি নিয়ে একটু দুরু দুরু বক্ষেই তাঁকে ছুঁয়ে ফেলা। তখন তিনি অনেক টানটান, সতেজ। লেখা দিয়েছিলেন। তবে নতুন নয়, পুরনো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমেনদা হয়ে উঠলেন দৈনিক বসুমতী সূত্রে। তখন কালিঘাটে বড় কাকিমার বাড়িতে থাকি। বসুমতীতে এক কলম খবর ছাপা হলে দশ টাকা। আমি দৈনিক বসুমতীর দক্ষিণ শহরতলির সংবাদদাতা।

আলিপুর কোর্ট, বা চিড়িয়াখানা থেকে খবর করে ফেরার পথে মাঝে মাঝেই প্রেমেনদার বাড়ি। কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। ততদিনে ও'র ছেলেরা, ছেলের বৌ, নাতনিরা আমার নামে এবং চেহারায় চিনে ফেলেছে। যখনই দেখা হতো, আমি কি করছি, চাকরি পাকা হচ্ছে না

কেন, কত টাকা পাচ্ছি—সব বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিতেন প্রেমেনদা।

মনে আছে একবার পুজো সংখ্যা বসুমতীর লেখার জন্যে তাগাদা দিতে গেছি প্রেমেনদাকে। বড় কবিতা লেখার কথা। তখনও ব্লাইণ্ড ফোল্ড লেখেন। হঠাৎ টেলিফোন তুলে দৈনিক বসুমতীর সাময়িকী সম্পাদক কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করলেন—আচ্ছা কল্যাণ, কিন্নরকে তোমরা চাকরি দিচ্ছ না কেন? ও এত ভালো ছেলে, খাটে...। ঠিক একই ভাবে ফোন করে দৈনিক বসুমতীর তখনকার সম্পাদক প্রশান্ত সরকারকে আমায় চাকরি দেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন অশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথা ছিল—শারদীয় বসুমতীতে নিশ্চয়ই বড় গল্প লিখব, কিন্তু কিন্নরকে চাকরি দিতে হবে। প্রেমেনদা এবং আশুদা দুজনেই এখন ছবির মানুষ, কিন্তু বেঁচে আছেন প্রশান্ত সরকার, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা এ ঘটনার সাক্ষী।

তখন প্রেমেনদা 'পক্ষীরাজ' সম্পাদনা করেন। প্রদীপ বলে একটি ছেলে 'পক্ষীরাজ' দেখাশুনো করত। প্রেমেনদা দু বার দুটি ছড়া চেয়ে নেন আমার কাছ থেকে এবং ছাপার পর তার সম্মান মূল্যটি তাঁর বাড়ি থেকে ভাউচারে সই করে নিয়ে যেতে বলেন। তখন কোনো চাকরি করি না। অর্থের ভীষণ প্রয়োজন। টাকার জন্যে আমায় যাতে ঘুরতে না হয়, তার জন্যেই এমনটি করেছিলেন প্রেমেনদা।

তাঁর লেখা এবং জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল-কলকাতা ঢাকা, কাশী, ভাগলপুর। ভীষণ আগ্রহ ছিল মানুষের বংশ, তাঁদের উৎস সম্বন্ধে। একটা ঘটনা বলি। তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রথম দিকে একদিন জিগ্যেস করেছিলেন আমাদের আদি বাড়ি।

ঢাকা শুনেই আবার প্রশ্ন, ঢাকার কোথায়?

আমি পাটগ্রামের বেশি আর বলতে পারি না। প্রেমেনদা তাঁর স্মৃতি থেকে পাটগ্রাম খুঁজে পান না। আমরা জন্ম সূত্রে ব্রাহ্মণ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ জেনে তিনি প্রশ্ন করেন, দাক্ষিণাত্য না পাশ্চাত্য বৈদিক? পাশ্চাত্য শুনে আবার

প্রশ্ন—তোমাদের গোত্র কি? বশিষ্ঠ গোত্র জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেন প্রবর কি?

এবার আমি থমকাই। আমার আর জানা নেই। মুহূর্তে প্রেমেনদা আদিশূরের আনা ব্রাহ্মণ, বাংলার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে যান। যার কোনোটই সেভাবে আমার মাথায় ঢোকে না। মানুষের বংশধারা চর্চার এই অভ্যাসই হয়ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র ঘনাদার পূর্ব-পুরুষের বংশাবলীকে এমন ভাবে বাঁধতে সাহায্য করেছিল।

অসম্ভব উৎসাহ ছিল খেলাধুলোর। টি ভি-তে খেলা দেখতেন। নিজে ভালো ফুটবল খেলতে পারতেন স্কুলে পড়ার সময়। আমার বড় মাসিমার ছেলে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খবর নিতেন। বিশ্বজিতের মেজদা হিরন্ময় কিছুদিন পড়িয়েছিল প্রেমেনদার দুই নাতনিকে। আর সে টিউশনি ঠিক করে দিয়েছিলাম আমি। মোহনবাগান ভালো খেলতে না পারলে ওঁর দুঃখের শেষ থাকত না।

ভালোবাসতেন নানান রকম খাবার দাবার। এর কিছু বর্ণনা ঘনাদার বিভিন্ন লেখার মধ্যে পাই। ঘনাদাও ছিলেন অসম্ভব ভোজনরসিক। খবর রাখতে চাইতেন দেশ-বিদেশের ভূগোল-ইতিহাস এবং অভিযানের। ইচ্ছে ছিল ভবিষ্যত-বক্তা নস্ত্রাদামু কে নিয়ে একটা ঘনাদা কাহিনী লিখবে। আমায় বার বার বলেছেন নীলনদের উৎস সন্ধানে যাওয়ার বর্ণনাময় একটি দীর্ঘ রোমাঞ্চকর ঘনাদা-কাহিনী লেখার ইচ্ছে তাঁর আছে। একবার বলেও ছিলেন আমায় ডিকটেশন দেবেন, এই লেখাটির।

আমার তাড়াতাড়ি লিখতে পারা, ঠিক ঠিক লেখা এবং পরিষ্কার হাতের লেখার ওপর প্রেমেনদার ভরসা দিল। তাই 'বিভাব' পত্রিকার সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত যখন বিশেষ গোয়েন্দা গল্প সংখ্যা বের করেন, তখন সমরেন্দ্রদাকে প্রেমেনদা বলেছিলেন, পরাশর নিয়ে বলতে পারি, যদি কিন্নর ডিকটেশন নেয়। আমি ডিকটেশন নিয়েছিলম আর গোয়েন্দা পরাশর বর্মা কিভাবে বাংলা সাহিত্যে এলেন, তার কাহিনী ছাপা হয়েছিল 'বিভাব'-এ।

শেষ দিকে চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না। তবুও একটি সোভিয়েত কাগজে শিলাকাছ মাছের বর্ণনা পড়ে যে 'মান্ধাতার টোপ' তিনি সাজিয়েছিলেন, তা পড়ে বার বার নতজানু হতে হয়। এবং ইদানীংকার 'বেস্ট-সেলারদের' ক্ষমতা বিষয়ে সন্দেহ জাগে

ইতিমধ্যে বসুমতীর দক্ষিণ শহরতলীর সংবাদদাতা থেকে, ছোটদের কাগজ 'সব জান্তা মজারু' হয়ে 'প্রতিক্ষণ'-এ চাকরি করতে পেঁৗছে গেছি। এখন মাস গেলে একটু ভদ্রস্থ টাকা মাইনে হিসেবে পাই। প্রেমেনদার সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়ে।

1981 সালে প্রথম ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাগজ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশিত হল। প্রথম সংখ্যাটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রয়াত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অশোককুমার সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রেমেনদা। এই কাগজের মালিক এবং সম্পাদক রবীন বল বহুবার প্রেমেনদার কাছে পাঠিয়েছেন আমায়। লেখার ব্যাপারে তাড়া দিতে, লেখা আনতে, ডিকটেশন নিতে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনাদা ক্লাব এবং কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ তৈরি হয় এবং মূলত রবীন বলের চিন্তা থেকে। সিদ্ধার্থ ঘোষ, ধরণী ঘোষ, জয়ন্ত দত্ত এবং এই আমিটি সহ আরও অনেকে ঘনাদা ক্লাব এবং কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর তো ছিলেনই।

ঘনাদা ক্লাবের প্রতীক চিত্র এক চোখ বোজা দাঁড়কাক এঁকেছিলেন রেবতী ভূষণ। 86'র জুন মাসে 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' একটি ঘনাদা সংখ্যা বের করে। এই সংখ্যাটিতে নানা দিক থেকে ঘনাদাকে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। বহু মূল্যবান লেখা ছিল সংখ্যাটিতে! ঘনাদার ঠিকুজি কুলজি আবিষ্কারের চেষ্ঠা শুরু করা হয়েছিল ঘনাদা ক্লাবের মাধ্যমে। যেমন ইংল্যাণ্ডে আছে শার্লক হোমস ক্লাব। এই সংখ্যায় প্রেমেনদার ঘনশ্যাম চরিতকথা' লেখাটি তৈরি করেছিলাম আমি।

ঘনাদা ক্লাবের মিটিং বসেছিল প্রেমেনদার বাড়িতেই। সম্ভবত দ্বিতীয় মিটিং সেটি। সেই অনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। যার প্রধান দুটি শাখা ঘনাদা ক্লাব ও সায়েন্স ক্লাব। সেই অনুষ্ঠানে লীলা মজুমদার বলেছিলেন, মৌ-কা-সা-বি-স আসলে ঘনাদাই। প্রেমেনদা শুনে হাসছিলেন। জবাব দেন নি। অবশ্য ততদিনে প্রেমেনদা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স লিখতে আরম্ভ করেছেন। সে লেখা নিয়েও অনেক হৈ-চৈ, সেই সভায় প্রচুর আড্ডা, হাসি আর কিঞ্চিৎ জমযোগেরও ব্যবস্থা ছিল!

চোখের অসুবিধেই হয়ত তাঁকে মৌকাসাবিস লিখতে বাধ্য করেছিল। আসলে ঘনাদা লেখার জন্যে যে বিপুল পড়াশোনা করা দরকার, তা তিনি করতে পারছিলেন না।

ঘনাদাকে নিয়ে প্রথম লেখা লিখেছিলেন 1928-29 সালে। দেবসাহিত্য কুটিরের পূজা বার্ষিকীতে। গল্পের নাম 'মশা'। পরে একটি দৈনিকে এই শালটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এবং পরে ঘনাদার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে, সেখানে একটি লেখা ও বেরোয়। ঘনাদার 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে যুগান্তর এর এখানে ওখানেতে আমিই প্রথম লিখি।

কথা ছিল কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে ঘনাদা আর

নীল নদের উৎস সন্ধান নিয়ে দীর্ঘ কাহিনীটি লিখবেন। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে এবং রবীনবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক কিছু কথাও হয়েছিল। কিন্তু শর্ত ঐ—আমাকে ডিকটেশন নিতে হবে। সে কাজ আর শেষ হলো না।

'ঘনাদা ক্লাব' কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান করেছে বলে ভীষণ খুশি ছিনেন। তবে চাপা ক্ষোভ ছিল এ ব্যাপারে আরও বড় কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে নি বলে। যুগান্তর-এ সাংবাদিক হিসেবে চাকরি নেয়ার পরও তাঁর সঙ্গে সমান যোগাযোগ ছিল। কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন, 'আত্ম জীবনীটা শেষ হলো না। শনিবারের চিঠি (নতুন পর্যায়) বন্ধ হয়ে গেল। এটা আবার অন্য কোথাও শুরু করতে হবে। আর ইচ্ছে ছিল দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী লেখার।

1988র 3 মে বেলা 3.05 মিনিটে বাড়িতেই মারা যান প্রেমেন্দ্র মিত্র। লিভার ক্যানসারে ভুগছিলেন এর কয়েকদিন আগে থেকে। নার্সিং হোম থেকে নিজেই বাড়ি চলে আসেন, সেরে উঠছেন না দেখে।

কোনোদিন তাঁর ঘরে পেছন দিকের সরু ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ছাড়া উঠিনি। ছোট একটা ফালি ছাদ পেরিয়ে তাঁর দরজায়। সেদিন বাড়ির সামনে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে। দরজার সামনে মন্ত্রি, পুলিশ, স্বরাষ্ট্র সচিবের সরকারি গাড়ি, অনেক পুলিশ, জোরালো আলো।

সেদিন হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট একটু যেন থমথমে। সন্ধ্যে সাতটা দশ নাগাদ অনেক আলো ভিড় মানুষ পেরিয়ে সামনের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে-

শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত

ছিলাম। খাটে ফুলে ফুলে, বেদনা—শ্রদ্ধায় সেজে শুয়ে আছেন। পরণে সিল্কের পাঞ্জাবি—যা পরতে ভালো-বাসতেন, পাট পাট চুল। বুকের ওপর 'ঘনাদার চিংড়ি বৃত্তান্ত'। পায়ের কাছে 'এষনা' পত্রিকা।

তাকে প্রণাম জানিয়ে সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে আবার একতলায়। তখন সেখানে ছোট ছোট জটলায় আলোচনা হচ্ছে, কাল স্কটিশচার্চ কলেজ, রবীন্দ্রসদন, কলেজ স্ট্রীট হয়ে কোন কোন রাস্তা ঘুরে মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে আসবে। 'কল্লোল' যুগের শেষ প্রতিনিধিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে চলে আসছিলাম। কানে বাজছিল তাঁর নানা কথা। বিশেষ করে ঘনাদা সম্পর্কে মন্তব্য—'ঘনাদা আসলে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই আছে, যে বাগাড়ম্বর করে। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা, সাহসের গপ্প বলে। আসলে সে রাম ভীতু।'

ঘনাদা ক্লাবের মিটিং বসেছিল প্রেমেনদার বাড়িতেই। গঠিত হয় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ। 'ঘনাদা ক্লাব'

অলিখিত ঘনাদা

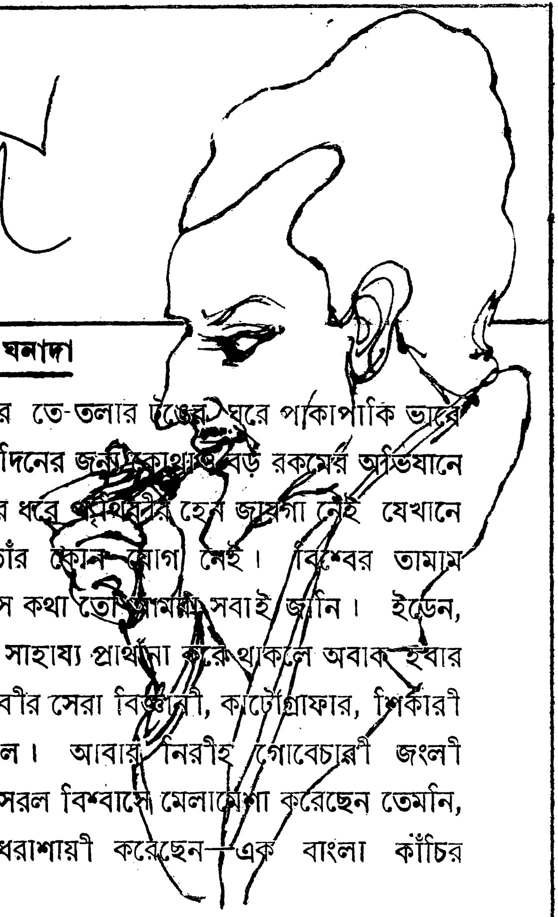

অলিখিত ঘনাদা

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের তে-তলার টঙের ঘরে পাকাপাকি ভাবে মৌরসি পাট্টা গাড়বার পর ঘনাদা খুব বেশী দিনের জন্য কোথাও বড় রকমের অভিযানে বের হন নি। তবে তার আগে প্রায় দুশ বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যান নি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই। বিশ্বের তামাম নেতৃবর্গের সঙ্গে যে ঘনাদার যোগাযোগ ছিল সে কথা তো আমরা সবাই জানি। ইডেন, ডালেস, চার্চিল, রুজভেল্টও গোপনে ঘনাদার সাহায্য প্রার্থনা করে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু রাষ্ট্রনায়কই নয়, পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী, কার্টোগ্রাফার, শিকারী ভূতত্ত্ববিদ্ কার সঙ্গেই না ঘনাদার পরিচয় ছিল। আবার নিরীহ গোবেচারী জংলী অসভ্য লোকজনদের সঙ্গেও ঘনাদা যেমন সরল বিশ্বাসে মেলামেশা করেছেন তেমনি, দুনিয়ার, ওঁচা খুনে বদমাস লোকদেরও ধরাশায়ী করেছেন—এক বাংলা কাঁচির সাহায্যে।

গত দুশ বছর ধরে দুনিয়াময় টহলদারি করা—ঘনাদার কীর্তিকলাপ আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তা সবই সুধীরের কল্যাণে। কিন্তু অনেক দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর ঘটনাই এখনো অপ্রকাশিত থেকে গেছে—যার আভাস দিয়ে গেছেন ঘনাদা স্বয়ং। এক টাইড্যাল ওয়েভের মাথায় কি করে একবেলায় ঘনাদা তাহিতি দ্বীপ থেকে ফিজি দ্বীপে পৌঁছেছিলেন—তা আমরা জানি না। কেনই বা তিনি তাহিতি দ্বীপে মুক্তোর ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন তা-ও অজ্ঞাত। কণ্ডর শকুনের বাসার খোঁজে আণ্ডিজের চুড়োর ওঠার পিছনে কি কোন রহস্য লুকিয়ে নেই? শোনা যায়, তিনি নাকি নীল নদের উৎস সন্ধানেও একবার বেরিয়েছিলেন। ভবিষ্যত বক্তা নস্ট্রাডামুর সঙ্গেও নাকি ঘনাদার পরিচয় ছিল। এইসব ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে অলিখিত ঘনাদা-কাহিনীর পূর্ণাঙ্গরূপ লিখে দেবার জন্য আমরা ঘনাদা-প্রেমী পাঠক-পাঠিকার কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

রসগ্রাহীতার বিচারে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

আইসোটোপ

সমীর কুমার ঘোষ

এক সময়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভর (Atomic weight) ভিন্ন হলেও, একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুর ভর সমান। তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা চালানোর সময়ে বিজ্ঞানী সডি (Soddy) 1913 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লক্ষ্য করেন যে, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে, তাদের ভর ও তেজস্ক্রিয় গুণাবলী ছাড়া, অন্যান্য সব ধর্মই এক। এই সব পদার্থগুলির পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic No.) একই, যদিও তাদের পারমাণবিক ভর ভিন্ন। পর্যায় সারণীতে এই সব পদার্থগুলি একই স্থান অধিকার করে। যেহেতু তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অর্থাৎ একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন রূপমাত্র, সেজন্য এই সব পদার্থগুলিকে পরস্পরের 'আইসোটোপ' (Isotope) বা 'সমস্থানিক' বলে।

আইসোটোপ সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা পেতে হলে, পদার্থের পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। যে কোন মৌলের পরমাণু, সাধারণতঃ প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন কণার দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রীনে (nucleus) থাকে প্রোটন ও নিউট্রন এবং কেন্দ্রীনের বাইরে থাকে ইলেকট্রন। স্বাভাবিক পরমাণুর ক্ষেত্রে (neutral atom), প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সর্বদা একই থাকে। প্রোটনের সংখ্যায় ভিন্নতা দেখা দিলে, পরমাণু তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। মৌলের মধ্যে তার প্রোটনের সংখ্যাই নির্দেশ করে তার পারমাণবিক সংখ্যা। কিন্তু তার মধ্যে যদি নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে তার পারমাণবিক ভর ভিন্ন হয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে। এরাই 'আইসোটোপ' নামে পরিচিত হয়, সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনে নিউট্রন সংখ্যার হেরফেরের জন্য আইসোটোপের উৎপত্তি হয়।

স্থায়ী মৌলিক পদার্থের মধ্যে আইসোটোপের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন স্যার J. J. Thompson। নিয়ন গ্যাস থেকে নির্গত পজিটিভ রশ্মির (positive ray) ধর্ম পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন যে, নিয়নের ক্ষেত্রে তার ভর-বর্ণালীবীক্ষণের ফটোগ্রাফিক প্লেটে, একটি অধিবৃত্তের পরিবর্তে দুইটি অধিবৃত্ত পাওয়া যায়। এই অধিবৃত্তগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে যেটির ঔজ্জ্বল্য (intensity) বেশি, সেটি 20 পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট নিয়নের পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট আর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন অধিবৃত্তটি 22 পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট নিয়নের পরমাণুর জন্য। এই দুইটি অধিবৃত্তের তীব্রতার অনুপাত থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন যে, নিয়নের পজিটিভ রশ্মিতে দুই ধরনের ধনাত্মক আয়ন আছে যাদের আপেক্ষিক অনুপাত 9 : 1 অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে নিয়ন গ্যাস পাওয়া যায়, তাতে 20 পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট পরমাণু আছে শতকরা 90 ভাগ এবং 22 পারমাণবিক আছে শতকরা 10 ভাগ, সুতরাং নিয়নের গড় পারমাণবিক ভর হবে $\frac{20 \times 9 + 22 \times 1}{10} = 20{\cdot}2$ এবং এই মান রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাওয়া নিয়নের পারমাণবিক ভরের একেবারে সমান, সুতরাং Thomson-এর এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। নিয়নের এই দুই ধরনের পরমাণুর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভর ছাড়া তাদের সকল রাসায়নিক ধর্মই এক এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই দুই ধরনের পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং এরা নিয়নের দুটি আইসোটোপ। যেহেতু রাসায়নিক ধর্মের বিচারে এরা অভিন্ন, সেজন্য পর্যায়সারণীতে এরা একই স্থান অধিকার করে। একই কারণেই এদের 'আইসোটোপ' বা সমস্থানিক' বলে। (Iso-same ; Topes-position)

শুধুমাত্র নিয়নের ক্ষেত্রেই নয়—এ পর্যন্ত বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রায় 310টি স্থায়ী এবং 4000 এরও বেশি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ আবিষ্কৃত হয়েছে। হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 1 কিন্তু হাইড্রোজেনের 1, 2 ও 3 সংখ্যাবিশিষ্ট তিনটি আইসোটোপের সন্ধান পাওয়া যায়। যেহেতু এদের সকলেরই পারমাণবিক সংখ্যা 1, সুতরাং এদের সকলেরই কেন্দ্রীনে 1টি করে প্রোটন আছে এবং এ তিনটি আইসোটোপ চিহ্নিত করা হয় $_1H^1$, $_1H^2$ ও $_1H^3$ দ্বারা। এরা যথাক্রমে সাধারণ হাইড্রোজেন, ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম নামে পরিচিত। সুতরাং ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটেরিয়ামের ক্ষেত্রে, তাদের

কেন্দ্রীনে 1টি প্রোটন ছাড়াও যথাক্রমে 1টি ও 2টি করে নিউট্রন থাকে। একই কারণে H_2O বলতে সাধারণ জল ও D_2O বলতে ভারী জল বুঝায়। এই ভাবে অক্সিজেনের ${}_8O^{15}$, ${}_8O^{16}$, ${}_8O^{17}$, ${}_8O^{18}$, ${}_8O^{19}$ নাইট্রোজেনের ${}_7N^{13}$, ${}_7N^{14}$, ${}_7N^{15}$; কার্বনের ${}_6C^{11}$, ${}_6C^{12}$, ${}_6C^{13}$ ও ${}_6C^{14}$; ইউরেনিয়ামের ${}_{92}U^{234}$, ${}_{92}U^{235}$, ${}_{92}U^{236}$, ${}_{92}U^{238}$ ইত্যাদি সংখ্যক আইসোটোপ পাওয়া যায়। পারদের (Hg) ক্ষেত্রে 7টি, ক্যাডমিয়ামের (Cd) ক্ষেত্রে 8টি ও টিনের (Sn) ক্ষেত্রে 10টি পর্যন্ত আইসোটোপ পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্ট একটি আইসোটোপের পারমাণবিক ভর অন্য আর একটি মৌলিক পদার্থের একটি আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের সমান। যেহেতু এই দুইটি পদার্থের পারমাণবিক সংখ্যা (At. No.) ভিন্ন, সুতরাং এদের রাসায়নিক ধর্মও ভিন্ন। এ রকম একই পারমাণবিক ভর বিশিষ্ট দুইটি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে (ভিন্ন পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট) পরস্পরের Isobar বলে।

আইসোটোপকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (natural radioactive) ; (খ) কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (artificial radioactive) ও (গ) অতেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (non-radioactive)। সীসার (Pb) আইসোটোপ ${}_{82}Pb^{204}$, ${}_{82}Pb^{206}$, ${}_{82}Pb^{207}$, ${}_{82}Pb^{208}$ ইত্যাদিরা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় ধরনের। সাইক্লোট্রন, বিভাট্রন প্রভৃতি ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে মৌলের পরমাণুতে নিউট্রন সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যায় এবং ${}_8O^{17}$, ${}_8O^{18}$, ${}_{17}Cl^{35}$, ${}_{17}Cl^{37}$ প্রভৃতিরা অতেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। মনে রাখা দরকার যে, নির্দিষ্ট একটি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আইসোটোপের প্রত্যেকটির পারমাণবিক ভর পূর্ণসংখ্যা (Mass No.) কিন্তু প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, তাদের বিভিন্ন আইসোটোপের অসম মিশ্রণের ফলে গঠিত হয় বলে, তাদের পারমাণবিক ভরের গড়মান সাধারণতঃ পূর্ণসংখ্যা হয় না।

বর্তমান যুগে আইসোটোপের ব্যবহার খুবই ব্যাপক। রাসায়নিক বিশ্লেষণে বা কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাসের আত্তীকরণ (assimilation) নির্ণয়ে আইসোটোপকে সন্ধানী মৌল হিসাবে (tracer) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পুরানো গাছের (fossil) বয়স নির্ণয়ের কাজে কার্বন আইসোটোপের (C^{14}) ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে, ক্যান্সার রোগ নিরাময়ে Co^{60}, রক্তের ব্যাধি নির্ণয়ে ফসফরাস (P^{32}) ও ক্রোমিয়াম (Cr^{51}) আইসোটোপের, কিডনীর ব্যাধিতে সোডিয়াম (Na^{24}), গলগণ্ড রোগ নিরাময়ে আয়োডিন (I^{131}) আইসোটোপের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। U^{238}) আইসোটোপের সাহায্যে পৃথিবীর আনুমাণিক বয়স নির্ণয়ের কাজ অনেক আগেই হয়েছে। কৃষি বিজ্ঞানে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে এবং কৃত্রিম সার বিষয়ক গবেষণায় তেজস্ক্রিয় তামা, দস্তা, সালফার ক্যাল-ক্যালসিয়াম ইত্যাদির আইসোটোপের প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে আজকাল। আগাছা দমন উদ্ভিদের রোগ নিরোধ এবং ফলনশীল শস্য উৎপাদনের কাজে আইসোটোপের ব্যবহার আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে রীতিমত চালু হয়েছে। এক কথায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আইসোটোপ আজ এক অপরিহার্য বস্তু হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি-নিকেতন।

উচ্চমাধ্যমিক ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অপরিহার্য

সমীরকুমার ঘোষ এর

আরও ফিজিক্স ক্যুইজ

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

গণিতের রত্ন ভাণ্ডার

নন্দলাল মাইতি

গণিত অনেকের ভাল লাগে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিষয়টি খুবই বিমূর্ত, আর এতে মজা পাওয়ার কোন বস্তু খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রাচীন গণিতে অনেক মজার মজার অংক লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া বর্তমানে আমরা স্কুলে যে-সব অংক করি, তার নমুনাও সেখানে দেখা যায়। প্রাচীন ভারত, গ্রীস, চীন প্রভৃতি দেশের গণিতের ইতিহাস পড়লে এ-সব জানা যায়, আমরা এখানে প্রথম আর্যভট্টের সূত্র অনুসরণে একটি পরিমিতির অংকের উল্লেখ করব। এই অংকটি প্রথম ভাস্করাচার্যের আর্যভট্টীয় ভাষ্যে দেখা যায়। আমরা প্রথম ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে এই কথাটি স্মরণ করতে পারি যে, উনি ছিলেন প্রথম আর্যভটের মতানুসারী জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ, এবং ব্রহ্মগুপ্তের সমসাময়িক অর্থাৎ আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

যে অংকের কথা আমরা উল্লেখ করব, সেটি আর্যভটের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম ভাস্কর বলেছেন। প্রথমে আর্যভটের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত সূত্রটি উল্লেখ করা যাক :

ত্রিভুজস্য ফলশরীরং সমদলকোটীভুজার্ধসংবর্গ।

অনুবাদ : শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির ওপর অংকিত লম্ব ও ভূমির অর্ধাংশের **গুণফল** হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল। ওপরের ওই সূত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে **ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল** $= \frac{1}{2} \times$ **ভূমি** $\times$ **উচ্চতা**। এই সূত্রটি আমাদের খুবই পরিচিত কিন্তু এই সূত্রের সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ, এই সূত্রটি প্রয়োগ করতে পারি কেবল ভূমি ও উচ্চতা জানা থাকলে। সমবাহু ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটি খুব সহজেই প্রয়োগ করতে পারি, এবং তা করেও থাকি। এই দুটি ক্ষেত্রেই শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমির ওপর লম্ব টানলে তা ভূমিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। ফলে, উচ্চতা নির্ণয় খুব সহজ হয়, (উচ্চতা)^2 = (পার্শ্ববাহু)^2—(ভূমির অর্ধাংশ)^2। অর্থাৎ $p^2 = a^2 - (b/2)^2$। কিন্তু বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আর্যভটের সূত্রের সরাসরি প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাই সে-ক্ষেত্রে অন্য সূত্রের প্রয়োগ করা হয়, এবং তা তোমাদের অজানা নয় : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, যেখানে $2s = a+b+c$। এই সূত্রটি ব্রহ্মগুপ্তের অবদান। এই সূত্রটি প্রথম ভাস্করের জানা থাকলেও তিনি এই সূত্রটি না দিয়ে আর্যভটের সূত্র থেকে কিভাবে অন্য পথে বিষমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব, তার বর্ণনা করেছেন। আমরা বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে কেবল সংশ্লিষ্ট জ্যামিতিক চিত্র ও সূত্রগুলি উদ্ধৃত করলাম।

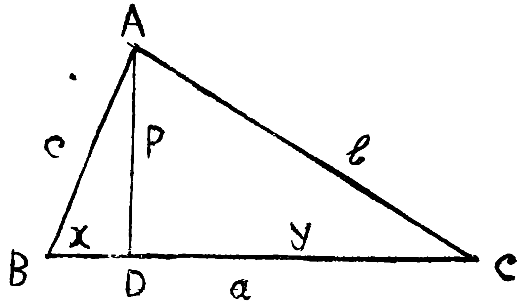

ওপরের ত্রিভুজ থেকে আমরা

$c^2 = p^2 + x^2$ এবং $b^2 = p^2 + (a-x)^2$ পাই ;

আবার এই দুটি সমীকরণ থেকে নিম্নলিখিত ফলগুলি পাই,

(i) $x = \frac{1}{2}\left(a + \frac{c^2 - b^2}{a}\right)$,

(ii) $y = \frac{1}{2}\left(a - \frac{c^2 - b^2}{a}\right)$,

এবং (iii) $p = \sqrt{c^2 - x^2}$ বা $\sqrt{b^2 - y^2}$।

এবার প্রথম ভাস্কর কর্তৃক প্রদত্ত একটি অংকের উদাহরণ দেওয়া যাক :

কর্ণত্রয়োদশ স্যাৎ পঞ্চদশান্যো মহী দ্বিসপ্তৈব।
বিষমত্রিভুজস্য সখে ফলসংখ্যা কা ভবেদস্য ॥

অনুবাদ : সখা, যে বিষমবাহু ত্রিভুজের একটি পার্শ্ব বাহু 13 একক, অন্যটি 15 একক, এবং যার ভূমি 14 একক, সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত ?

আমরা সহজেই ব্রহ্মগুপ্তের সূত্র প্রয়োগ করে অংকটি নিমেষে কষে ফেলতে পারি। কিন্তু প্রথম আর্যভট তথা প্রথম ভাস্করের সূত্র অবলম্বন করে অংকটি কষতে হবে। আমরা এখানে কেবল উত্তরটি জানাচ্ছি : 84 বর্গ একক। শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিক চিত্র অংকন করে অংকটি সমাধান করুক, এই আমাদের অভিপ্রায়।

ঠাকুরাণীচক, হুগলী—712613।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ, কিন্তু সর্বজনপাঠ্য নয়

গ্রন্থটির লেখক খ্যাতনামা পরমাণুবিজ্ঞানী ডক্টর সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র। একশত বাহান্ন পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টি হলো ইতিহাসের মহাবিশ্ব। যুগে যুগে মানুষ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করতো। এ অধ্যায়টিতে সেই সব ধারণার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। মহাবিশ্ব বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট, এখনও তাই। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা পালটিয়েছে এবং পালটাচ্ছে। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানী কি ধারণা পোষণ করতেন তার বিবরণও আছে এই গ্রন্থে। একজন পদার্থ বিজ্ঞানী মহাবিশ্বকে কেমন চোখে দেখেন তার পরিচয়ও মিলবে এই গ্রন্থে। এ ভিন্ন বিভিন্ন মৌলিক কণা এবং তাদের স্বরূপ জানা যাবে তৃতীয় অধ্যায়ে। কুয়ার্ক কি, তার প্রকৃতি কেমন, দৃশ্য ও অদৃশ্য বর্ণালী, নিউট্রন নক্ষত্র, কোয়াসার, শ্বেতবিবর, কৃষ্ণবিবর, ছায়াপথ, বোসন কণা, ইলেকট্রোনিউক্লিয়ার বল, নক্ষত্রশক্তির উৎস, মৌলিক ও যৌগিক স্থিরাঙ্ক, মহাবিশ্বে স্থিরাঙ্কের ভূমিকা ইত্যাদি অনেক অজানা বিষয়কে জানা যাবে মহাবিশ্বের পরিচয় পেতে হলে। এ জন্যে বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদর্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নচেৎ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত মানুষ যতটা জেনেছে তা বোঝা যাবে না। মহাবিশ্বকে ও তার গঠন প্রকৃতিকে কি মানুষ ভালভাবে জানতে পেরেছে?—না, আজও তা পারে নি। পারেনি মহাবিশ্বকে যথাযথ ভাবে আবিষ্কার করতে। লেখকের ভাষাতেই বলি "মহাজগৎতত্ত্বের বিপুল জটিলতায় বিজ্ঞানে কখনও কখনও দর্শনের আমেজ এসে যায়, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা প্রমাণ করেছে যে দার্শনিক মেজাজে নয়, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই মানুষের মহাবিশ্বকে যথাযথ ভাবে আবিষ্কার করতে হবে।'

পরিশেষে একটা কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হলো: এই গ্রন্থের প্রকাশক তাঁর কথায় লিখেছেন "সাধারণ পাঠকের জন্য আমাদের পরিকল্পনায় প্রথম বই হিসেবে 'মহাবিশ্বের কথা' প্রকাশিত হল।" কিন্তু আমার মতে এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠক আংশিক বুঝতে পারবেন, অধিকাংশটাই বুঝতে পারবেন না—যদি না তাঁর বিজ্ঞান ভাল জ্ঞান না থাকে। তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এক পণ্ডিত অধ্যাপক বিজ্ঞানীর কলম থেকে রচিত হয়েছে এক অনবদ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ভাষা কিন্তু সর্বত্র সহজ ও সাবলীল নয়। অবশ্য এমন এক জটিল বিষয় এটি, যে তাকে আরও সহজতর ভাবায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন কাজ। তবুও গ্রন্থকার ও প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই, এমন একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের জন্য।

মহাবিশ্বের কথা ॥ সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র
সাহিত্য বিহার, কলকাতা 7 ॥ দাম 20·00
অমরনাথ রায়

বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা

গোবরডাঙ্গা যুব বিজ্ঞান সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রিজম' (ত্রৈমাসিক) অন্যতম। মফঃস্বল থেকে এই পত্রিকাটি যে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—এটা খুবই আনন্দের কথা। শুধু 'প্রিজম' পত্রিকা প্রকাশই নয়, গোবরডাঙ্গা যুব বিজ্ঞান সংস্থা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যে নানান্ অনুষ্ঠান নিয়মিত করে থাকেন। সংস্থার বার্ষিক প্রদর্শনীতে স্থান পায় সংস্থার সদস্যদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের মডেল ও প্রজেক্ট। সংস্থার একটি 'হেল্‌থ ইউনিট' আছে। বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আধুনিক সাজ সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত ছিল সেই ইউনিটটি। সংস্থা কক্ষে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্র, বিতর্ক ও ক্যুইজ প্রতি-যোগিতা।

আরেকটি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা আমাদের হাতে এসেছে—নাম 'বিজ্ঞানের আঙিনায়'। এটিরও দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন সায়েন্স ক্লাব (25নং ফার্ণ রোড, কলকাতা-19) কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় কবিতা, বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক ক্যুইজ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা স্মরণ করা যেতে পারে যে এ বছর জগবন্ধু ইনস্টিটিউ-শনের 75 বছর পূর্তি হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সহ-উপাচার্য ডঃ দিলীপ কুমার সিংহ এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন ছাত্র, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্য এবং তিনি 1990-1991 সালের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

অরকিড

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

অরকিডের ফুল ভুবন-বিখ্যাত। অপূর্ব তার শোভা। বেশীর ভাগ অরকিডই দেখতে ভারি সুন্দর, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তাই এগুলি ঘর সাজানোর জন্যে, এবং মেয়েদের অঙ্গাভরণের জন্যে, সারা বিশ্বে সমাদৃত।

পৃথিবীর প্রায় সবজায়গায়ই অরকিড পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শীত-প্রধান অঞ্চলে। বেশী দেখা যায়, সিকিমে, হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে, ইন্দো-মালয়ে, এবং আমেরিকায়। সুন্দর সুন্দর অরকিডের চাহিদা সারা বিশ্বে। বিদেশের বাজারে, উন্নত মানের অরকিডের যেমন চাহিদা, তেমনি দাম। এজন্য সিকিমে সবুজ ঘরে (Green house) অরকিডের চাষ করা হয়। নানা জাতের সুন্দর সুন্দর অরকিড রপ্তানি ক'রে, ভারতে এখন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। রবীন্দ্রনাথও অরকিডের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর 'মালঞ্চ' উপন্যাসে অরকিডের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তিনি লিখেছেন,—"সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অরকিড। ফুলটি শুভ্র, পাঁপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি।"

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ইউরোপের অধিবাসীরা তখনও অরকিড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী জ্যাকব ব্রেইনিয়াস অরকিড নিয়ে অনেক গবেষণা করেন, এবং অরকিডের নানা বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। অরকিডের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে, একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন—"অরকিডের সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। অরকিড দেখে কখনও মনে হয় যেন ছোট্ট একটি পাখি, কখনও গিরগিটি, কখনও বা চিত্রবিচিত্র প্রজাপতি। কখনও মনে হয় মানুষের মতো। আবার কখনও দেখায় সুন্দরী মেয়ের মতো। হঠাৎ এক-এক সময় মনে হয়, তা যেন ভয়ংকর কোনো যোদ্ধা। একটা একটা অরকিডকে দেখে মনে হয়েছিল, ঠিক যেন সার্কাসের ক্লাউন, আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। অনেক সময় অরকিডকে দেখে মনে হয়, ওটা বুঝি বিরাট একটা কচ্ছপ, জীবন্ত, গুটিগুটি হেঁটে চলেছে। আবার কখনও মনে হয়, বিষণ্ণ এক ব্যাঙ, গাছের আড়ালে চুপটি ক'রে বসে আছে। অথবা একটা রাগী বাঁদর, গাছের ডালে দোল খাচ্ছে। এই রকম অরকিড দেখলেই হাসি পায়। আর হাসি যদি না-ও পায়, তবে এদের অপূর্ব সৌন্দর্যের তারিফ অবশ্যই করতে হয়।"

অরকিড (Orchid) অরকিডেসিঈ (Orchidacea) গোত্রের উদ্ভিদ। উদ্ভিদ্-জগতে এইটিই সবচেয়ে বড় গোত্র। এই গোত্রে যে কত রকম উদ্ভিদ্ আছে তার হিসেব রাখাই কঠিন। এতে 500-600 জাতি (Genera) ওবং 20,000-35,000 প্রজাতি (Species) আছে। অরকিড সাধারণভাবে সপুষ্পক, বর্ষজীবী, বীরুৎ (Herb) শ্রেণীর উদ্ভিদ্। কেউ মাটিতে জন্মায়, কেউ পরাশ্রয়ী (Epiphytic), আবার কেউ হয়তো মৃতজীবী (Saprophytic)। অরকিড সাধারণতঃ পাওয়া যায়, ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে, প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সমভূমি অঞ্চলে, অ্যাল্পাইন-ভূমিতে, উচ্চ-পার্বত্য অঞ্চলে, কিংবা গভীর উপত্যকায়। বরফে ঢাকা মেরুপ্রদেশে, এমন কি অ্যান্টার্টিকা অঞ্চলেও, অরকিড দেখতে পাওয়া যায়।

অরকিড সাধারণতঃ গাছের গুঁড়িতে বা শাখা-প্রশাখায় পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ্ হিসেবে জন্মায়। কখনও জন্মায় কাঠের খুঁটিতে, আবার কখনও জন্মায় মাটিতে বা প্রস্তরখণ্ডে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, অরকিডের বীজের অংকুরোদগমের জন্যে ছত্রাকের আক্রমণ বিশেষ প্রয়োজন।

পরাশ্রয়ী অরকিডের বেলায় কতকগুলি মূল আশ্রয়দাতাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, আর কতকগুলি বাতাসে ঝুলে থাকে। এইরূপ বায়বীয় মূলের একপ্রকার বহিরাবরণ থাকে। তাকে ভেলামেন (Velaman) বলে ভেলামেন বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প শোষণ করে নিতে পারে। যেখানে পচনশীল পদার্থ

ক্যাটলিয়া (Cattleya) অরকিডের গাছ এবং ফুল

থাকে, সেখানে মৃতজীবী অরকিড জন্মায়। এদের মূলের সঙ্গে একরকম ছত্রাক থাকে। তার সাহায্যে এরা মাটি ও পচনশীল দ্রব্য থেকে রস গ্রহণ করে নিজ দেহের পুষ্টি সাধন করে।

কোনো কোনো অরকিডের কাণ্ড রাইজোম (Rhizome) বা কন্দ-জাতীয়। কাণ্ডের পর্ব থেকে পাতা জন্মায়, এবং সাধারণতঃ পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম দিকে সাজানো থাকে। পাতা মোটা, এবং প্রায়শঃই পাতার গোড়ার দিক কাণ্ডকে বেষ্টন ক'রে থাকে।

অরকিডের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ হ'ল তার ফ‍ুল। প্রথমে কুঁড়ি বেরোয়। সেই কুঁড়ি থেকেই ফোটে নয়ন-ভোলানো মন-মাতানো অরকিড ফুল। ফুলের আকার ও আয়তন নানা রকম হতে পারে। কোনো ফুল যেন লিলি-পুট; যেমন—প্ল্যাটিস্টীল অরনাটা (*platystele ornata*), এর পরিধি মাত্র এক মিলিমিটার। আবার কোনটি বেশ বড় হয়, এক ফুট কিংবা তারও বেশী। অরকিড ফুল এককভাবে থাকতে পারে, অথবা একসঙ্গে অনেকগুলি ফুটে থাকে। যেমন, অনকিডিয়াম কারথাজিনেন্স (*Onchidium carthaginese*)-এর মঞ্জরী-দণ্ডটি 12 ফুট লম্বা, তাতে একসঙ্গে প্রায় একশ'টি ফুল থাকে। অধিকাংশ অরকিড ফুল থেকেই বেরোয় মন-মাতানো সুগন্ধ। রঙেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। দেখে মনে হয়, অরকিড ফুল যেন এই পৃথিবীর অনেক কিছু অনুকরণ করতে পারে। কোনটি দেখতে ঠিক বাঁদরের মতো, কোনটি যেন ছোট্ট ষাঁড়,

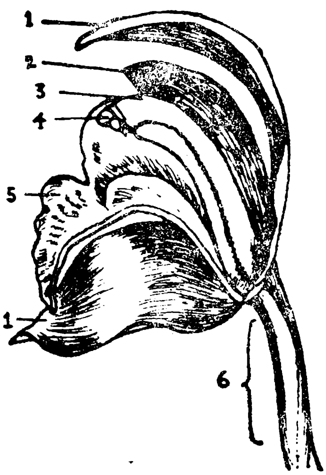

সিম্বিডিয়াম (Cymbidium) অরকিডের ফুল (লম্বচ্ছেদ)— 1. বৃত্যংশ Sepal), 2. দল (Petal), 3. কলাম (Column). বা দণ্ড, 4. পরাগধানী (Anther). 5. ল্যাবেলাম (Labellum), 6. ডিম্বাশয় (Ovary)।

কোনটি যেন মহিলার চটিজুতো, আবার কোনটি যেন প্রজাপতি।

অরকিড ফুল খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। একই ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর দুই-ই থাকে। প্রতি ফুলে বাইরের দিকে তিনটি ক'রে বৃত্যাংশ (sepals), এবং ভেতরের দিকে তিনটি ক'রে দল বা পাপড়ি (petals) থাকে। বৃত্যাংশ ও পাপড়ি পৃথক্‌ভাবেই থাকে। পাপড়ির রঙ নানা রকম হতে পারে, তবে রঙ সাধারণতঃ উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়। অনেক সময় একটি পাপড়ি ল্যাবলামে পরিণত হয়। পাপড়ি ও ল্যাবেলাম মিলে নানা আকার ধারণ করে, এবং ফুলটিকে এক বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে।

পুং-স্তবকে সাধারণতঃ একটি পুং-কেশর থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে দু'টি। পরাগধানী দু'টি, কোনো কোনো ফুলে চারটি। রেণুগুলি পরাগধানীর ভিতরে একপ্রকার মোমের মতো পদার্থ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

স্ত্রী-স্তবকে তিনটি গর্ভপত্র (Carpels)। তিনটি গর্ভমুণ্ড (stigma), কিন্তু তাদের একটি বন্ধ্যা। তিনটি গর্ভপত্র, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, দণ্ডের মতো আকৃতি (column) ধারণ করে। একে গাইনানড্রিয়াম (Gynandrium) বলে। প্রকৃতপক্ষে পুংকেশর, গর্ভদণ্ড এবং গর্ভমুণ্ড—এই তিনটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অংশটি গঠন করে। পরাগরেণুগুলি দু'টি থলিবিশিষ্ট 'পলিনিয়া' নামক বিশেষ অঙ্গে অবস্থান করে। গর্ভপত্রের নীচের দিকে এক-কুঠুরিবিশিষ্ট একটি ডিম্বাশয় (Ovary) থাকে। ডিম্বাশয়টি পেয়ালার মতো পুষ্পাধার (Thalamus) এর সবচেয়ে নীচের দিকে অবস্থিত। গর্ভপত্র পুষ্পাধারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত। ফল ক্যাপসুল-জাতীয়। ছোট ছোট বীজ হয়, বীজের ওপর পাতলা খোসা থাকে।

কতকগুলি অরকিডের বেলায় পরাগ-সংযোগের পদ্ধতি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। পরাগ-সংযোগ হয় প্রধানতঃ পতঙ্গের সাহায্যে। এ ছাড়া পাখি, বাদুড়, সাপ, এবং ব্যাঙের সাহায্যেও পরাগ-সংযোগ হতে পারে। কোনো কোনো অরকিডে একটি পাপড়ি চিত্র-বিচিত্র ল্যাবেলামে পরিণত হয়, এবং তা নীচের দিকে থলির আকারে বেড়ে যায়। এর মধ্যে সুমধুর গন্ধযুক্ত রস নিঃসৃত হয়, যা মৌমাছিকে আকর্ষণ করে। এই মধুর লোভে মৌমাছিরা ফুলের ওপর বসে। কিন্তু সে জায়গাটা খুব পিছল। তাই মৌমাছিটি পা পিছলে পড়ে যায়, গাইনানড্রিয়ামের মধ্যে যেখানটা দেখতে অনেকটা ওলটানো স্লেজগাড়ির মতো। এর ফলে মৌমাছির গায়ে 'পলিনিয়া' লেগে যায়। সুতরাং ঐ মৌমাছি যখন অন্য ফুলে মধু খেতে যায়, তখন ঐ

'পলিনিয়া' সেই ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তরিত হয়, এবং পরাগ-সংযোগ ঘটে।

আল্‌জিরিয়ার একরকম অরকিডের নাম অফ্রিস্‌ স্পেকুলাম (*Ophrys speculum*)। এর বেলায় একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। এর ফুল আকৃতিতে, বর্ণে এবং গন্ধে অবিকল এক রকম পতঙ্গের (*Scolia ciliata*) স্ত্রী-রূপ ধারণ করে। এই রূপ দেখে প্রলুব্ধ হয়ে, পুরুষ পতঙ্গটি, মিলনের আশায়, তার দিকে ছুটে আসে। তার ফলে সহজেই পরাগ-সংযোগ ঘটে যায়।

সিক্‌নোকেস (cycnoches) ফুলের কাছাকাছি কোনো সেণ্ট্রিস ফেসিয়াটা (*centris fasciata*) পতঙ্গ এলেই, সে তার গায়ে কিছু তরল পদার্থ স্প্রে ক'রে অর্থাৎ ছিটিয়ে দেয়। এর মধ্যে থাকে 'পলিনিয়া' সেগুলি ঐ পতঙ্গের পেটে আটকে যায়। তারপর ঐ পতঙ্গটি যখন অন্য ফুলের মধু সংগ্রহ করতে যায়, তখন ফুলের আঠালো গর্ভমুণ্ডে পলিনিয়াগুলি লেগে যায়। এর ফলে পরাগ-সংযোগ হয়।

কোরিয়ানৃথেস্‌ (coryanthes) জাতীয় অরকিডের পরাগ-সংযোগের পদ্ধতি আরও চমৎকার। ফুলের মুখে থাকে একটি বালতির মতো থলে। তার মধ্যে থাকে তরল পদার্থ কোনো পতঙ্গ মধু খেতে এলে, এর মধ্যে পড়ে যায়। এর ওপর দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ থাকে। যে অঞ্চলে 'পলিনিয়া' থাকে, এটি ঠিক তার নীচে অবস্থিত। পতঙ্গটি ফুলের মধ্যেকার ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে, অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেই সময় ঐ পতঙ্গের গায়ে 'পলিনিয়া' লেগে যায়। এরপর ঐ পতঙ্গ যখস অন্য ফুলে মধু খেতে যায়, তখন ঐ 'পলিনিয়া' অন্য ফুলে স্থানান্তরিত হয়, এবং তার ফলে পরাগ-সংযোগ ঘটে।

সমগ্র বিশ্বের সৌখিন মানুষদের কাছে; শখের জিনিস হিসেবে, নানা রকম অরকিডের প্রচণ্ড চাহিদা। এই কারণে সব দেশেই এখন সবুজ ঘর (Green house)-এ নানা রকম অরকিডের চাষ করা হয়। এদের লালন-পালন করা হয় বিশেষ যত্ন সহকারে। তারপর সাবধানে তুলে, সযত্নে প্যাক ক'রে, দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার অরকিডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এগুলি সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত—

Cgtlleya labinta, *Cypripedium Sanderianvw* (Sander's Lady's slipper), *Disa grandiflora*, *Miltvnia spectabilis*, *Odontoglossum crispum*. *Oncidium papillo*, *Orchis maculata*, *Paphiopedilium glancophyllum*, *Vanda sandariana* (Sander's Vanda), *Zygopetalum lawrenceinum*.

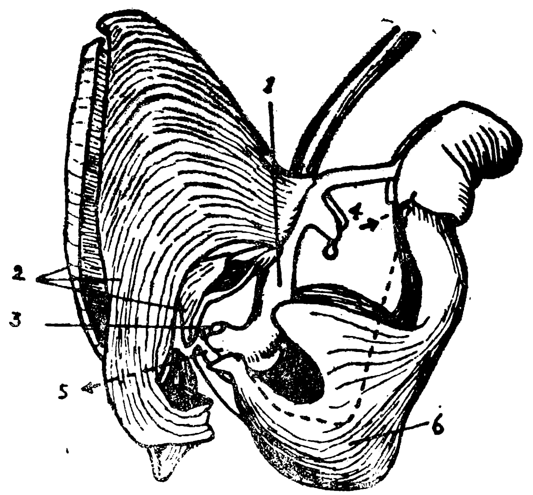

কোরিয়ানৃথেস্‌ (Coryanthes) অরকিডের ফুল—1. কলাম (Column) বা দণ্ড, 2. বৃত্তাংশ (Sepal), 3. পলিনিয়া (Pollinia), 4-5. মৌমাছির গতিপথ, 6. বালতি (Bucket)-এর মধ্যে এক রকম তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে।

অরকিডের অনেক রকম ব্যবহারের কথাও এখন জানা গেছে। প্রাচীনকালে অরকিড ফুলের, এবং গাছের অন্যান্য অংশের, অদ্ভুত আকৃতির জন্যে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, এদের হয়তো যাদু ক্ষমতা অথবা ভেষজগুণ আছে। মধ্য যুগের ইউরোপীয় ভেষজবিদ্‌রা অরকিডের শিকড়ের ভেষজ-গুণের কথা বলেছেন। ইন্দোনেশীয়ার অ্যামবোইনা দ্বীপের অধিবাসীরা গ্রামাটোফাইলাম থেকে একপ্রকার মলম বানাতো, যা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত বা ফোঁড়ার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হ'ত। এখনও চর্মরোগের চিকিৎসায় ডেন্‌ড্রোবিয়াম ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকায় হাবেনারিয়া থেকে এক প্রকার বমনো-দ্রোককারী ওষুধ বানানো হয়। এপিডেনড্রাম বাইফিডাম থেকে কৃত্রিম ওষুধ তৈরি করা হয়। ইউলোফিয়া থেকেও কৃমির ওষুধ তৈরি হয়। স্পাইর‍্যানৃথেস্‌ থেকে তৈরি হয় মূত্রবর্ধক ওষুধ। আর জিওডোরাম ডেন্‌সিফ্লোরা কীটনাশক-রূপে ব্যহৃত হয়।

জুমেলিয়া ফ্রাগ্‌রেন্‌স দিয়ে এক প্রকার চা তৈরি করা হয়। যা স্বাদে ও গন্ধে অতি উত্তম। আর ভ্যানিলা প্ল্যানিফোলিয়া আরকিডের ক্যাপ্‌সুল থেকে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে, তৈরি করা হয় ভ্যানিলা, যা সুগন্ধি দ্রব্য হিসেবে সর্বত্র খুবই সমাদৃত।

13A, ওলাই চণ্ডী রোড, কলকাতা-37

প্রাণীজগতের বিচিত্র ঘটনা

সিদ্ধার্থ কর্মকার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন অনেক রকম আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটতে দেখি, তেমনই প্রাণীদের মধ্যেও এরকম অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। সেইসব অসংখ্য বিচিত্র ঘটনা সমূহের মাত্র কয়েকটির কথা তোমাদের আজ বলবো।

□ □ □ □ □ □

কোন মানুষ কি তার শরীরের তুলনায় একশোগুণ বেশী দূরে লাফ দিতে পারে? নিশ্চই নয়। কিন্তু গঙ্গাফড়িং পারে। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রমাণিত সত্য। সাধারণতঃ একটা গঙ্গা ফড়িং-এর দৈর্ঘ্য বড় জোর এক ইঞ্চির কিছু বেশী। কিন্ত এরা এক লাফে অনায়াসে আট ফুট চার ইঞ্চি পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে পারে।

□ □ □ □ □ □

পানামা দেশে এক ধরণের টিকটিকি দেখা যায়, যারা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে কৌশলে শত্রুর হাতে লেজটি রেখে পালিয়ে যায়। আসলে এর কারণ হল—এদের লেজ-এর গঠনটি অদ্ভুত। এদের লেজের মাংসপেশীগুলি এমনভাবে তৈরী হয় যে, এরা এদের দেহের সংলগ্ন লেজটি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। তবে নতুন লেজ না গজানো পর্যন্ত এরা নিজেদের বাসাতেই আত্মগোপন করে থাকে। আবার লেজ গজালে তবেই বাইরে বের হয়।

□ □ □ □ □ □

একটু লক্ষ্য করলেই তোমরা দেখতে পাবে কুকুর ঘুমোনোর আগে তার শয়নস্থলের চারপাশে বারকয়েক বৃত্তাকারে ঘুরপাক খেয়ে নেয়। তারপর শোয়। কেন? আসলে কুকুর ঐভাবে ঘুরে ঘুরে অনুভব করার চেষ্টা করে যে হাওয়া বা বাতাস কোন দিক থেকে আসছে। যে দিক থেকে হাওয়া আসছে সেদিকেই মাথা রেখে শোয়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। ফলে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ করতে আসলে তারা ঘ্রাণের দ্বারাই টের পায় সহজে।

পুরুষ সজারু তার পরিবারের জন্যে আস্তানা তৈরীর কাজে যথেষ্ঠ মেহনত করে। কি দুঃখের বিষয় সারাটা গ্রীষ্মকাল তাকে বাসার বাইরেই কাটাতে হয়। কেন না, স্ত্রী সজারু এই সময় বাচ্চা প্রসব করে এবং একটা বাচ্চার আকার প্রায় একটা ভালুক ছানার মতোন। ফলে মা ও শিশু ঐ আস্তানার সব জায়গাই প্রায় দখল করে থাকে। এই কারণেই পুরুষ সজারুর কপালে তার নিজের আস্তানাতে থাকার জায়গা মেলে না।

□ □ □ □ □ □

তোমরা কি জানো, প্রাণী জগতে পিঁপড়েরাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গৃহপালিত প্রাণী পালন করে। এদের গৃহ-পালিত প্রাণীর সংখ্যা পাঁচশোরও বেশী। মানুষ যেমন গরু, ছাগল ইত্যাদিকে পোষ মানায়, মাঠে চড়াতে নিয়ে যায়, পিঁপড়েরাও তাদের পোষ্য পতঙ্গকে পোষ মানায়, চরাতে নিয়ে যায়, পরিচর্যা করে। এমন কি এদের জন্যে আলাদা বাসস্থানও তৈরী করে দেয়। আসলে এইসব পতঙ্গগুলি থেকে তারা এক ধরণের রস সংগ্রহ করে—যা, পিঁপড়েদের পক্ষে অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয়।

□ □ □ □ □ □

গিরগিটির আর এক নাম যে বহুরূপী তা' তোমাদের কারও নিশ্চয় অজানা নয়! এরা নিয়মিত রঙ বদল করতে পারে। কিন্তু এদের যে আচরণটি বিস্ময়কর তা' হল—বসন্ত কাল থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এদের দেহের চামড়া বিবর্ণ ও ধূসর হয়ে লেজের মাথা থেকে উঠে আসে এবং এই সময়টা তারা এই চামড়া খেয়ে জীবনধারণ করে। তোমরা কথাটি শুনে শিউরে উঠছো বটে—তবে মনে রোখো এদের কাছে নিজের শরীরের চামড়া যথেষ্ট উপাদেয় বস্তু।

9, রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট কলিকাতা-700006।

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

ওরে ব্বাস রে!
মেজকা তুমি কোথায়? ও-ও-ওটা কী? ভূ-ভু-ভূ—
ইডিয়েট! আমি ভূত নই, তোর মেজকা! গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছিস না?
তাই বল, তুমি গ্যাস মাস্ক লাগিয়েছ! এক ঘর ধোঁয়ার মধ্যে মাস্ক পরে এসব হচ্ছেটা কী?
মশার জ্বালায়– সুদ্ধু মশার জ্বালায় এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে!
খক্-খক্, মশার জন্যে এত! খক্ খক্ খক্
হ্যাঁ। মশার জন্যে কোন কাজ করতে পারছিলুম না। তাই এক ডজন মশার ধূপ জ্বালিয়ে, গ্যাস মাস্ক পরে তবে কাজ করতে বসেছি।
খক্ খক্, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে মেজকা!
আর একটা মাস্ক আছে পরে নে। নয় তো এখানে এক মুহূর্ত তিষ্ঠতে পারবি না।
কি-কিন্তু মেজকা, এ ভাবে কতক্ষণ চলবে? পরে তো আবার যে কে সেই! তখন?
তখন মশারির ভেতর।
এটা তো কোনো সমাধান নয়। ধোঁয়াতে মশা মরে না। আমি তোমাকে মশা মারার একটা ভাল উপায় বাতলে দিচ্ছি।

প্রথমেই তোমার ঐ এক ডজন ধূপকাঠি নেভাতে হবে। এবং ঐ বাঁদুরে মুখোশ খুলতে হবে।
থাক খুদে, তোর দৌড় বুঝেছি। তুই ঐ মশা মারার ওষুধ স্প্রে করবি তো? এ দিয়েও ওদের কাবু করা কঠিন।
আঃ, মেজকা। আগে কাজটা করতে দাও তারপর ভাল ভাল মন্দ বিচার করবে। তোমার ঐ স্প্রে-ফ্রের দৌড় আমারও জানা আছে।
তাহলে?
সেটাই তো তোমাকে দেখাবো।
এর জন্য চাই একটা বড় এবং হালকা থালা। আর চাই এক পলা তেল। অ রেপসিড অর মাস্টার্ড অয়েল—একটা হলেই হবে।
খুদে, আমার কিন্তু এ সব ছেলেখেলা একদম পছন্দ নয়।
এটা ছেলেখেলা মোটেই নয়, পুরোপুরি সায়ান্টিফিক এবং হাতেনাতে ফল। খালি দেখে যাও।
খুদে ভেবেছে কী! তেল দিয়ে মশাদেরও বশ করবে?
তেলটা আঙুল দিয়ে থালাটায় মাখিয়ে নিলুম। ব্যাস, মশা মারার মোক্ষম অস্ত্র তৈরী। মশারাও আসতে শুরু করেছে।
শুরু হল মশক নিধন! হেঁইয়ো!
হেঁইয়া!

নাঃ, ঘটনাটা এখানেই শেষ নয়। বাকিটুকু আগামী সংখ্যার জন্য তোলা রইল।

সাইকেল কিভাবে এলো

জহর মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা। প্রায় চার হাজার বছরেরও বেশি। তৈল সম্পদের জন্য বিখ্যাত বর্তমান ইরাক দেশের নাম ছিল তখন মেসোপটেমিয়া। সেই দেশের এক কুমোরের বছর দশেকের ছেলে একদিন কাঠ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে হাঁড়িকুড়ি বানানোর চাক বয়ে আনছিল। অনেকটা রাস্তা, আর চাকাটাও ছিল বেশ ভারী। তাই সে ক্লান্ত হয়ে এক গাছতলায় এসে বসল; ভাবল দু-দণ্ড জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটবে। স্নিগ্ধ ছায়ার স্পর্শে বিশ্রাম নিতে গিয়ে এক সময় ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলেটার বাবা ছিল বেজায় খিটখিটে। তার উপর যখন তার ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পাতলা অন্ধকার নেমেছে। ছেলেটা তো তড়াক্ করে ঘুম থেকে উঠে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ কচলে দেখল আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে। সে তখন তাড়াতাড়ি গোল চাক্‌খানা মাথায় তুলতে গেলো। তখন তার হাত ফসকে ঢালু রাস্তায় কিছুটা পথ গড়িয়ে চলল চাক্‌টা। ব্যাপার দেখে খুশীতে তার মন ভরে গেল। আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা ছুঁড়ে দিয়ে সে আনন্দে নাচতে লাগল। চাক তখন 'চাকা'।

মানুষ জন্মের পর থেকেই চায় গতি। ছোট্ট একটা শিশুও টাল-মাটাল পায়ে হাঁটতে চায়। ছেলেটা দেখল এতো ভারী মজা। তাই সে চাকখানা আর মাথায় না তুলে সোজা করে নিয়ে দিল ধাক্কা। কিছুটা পথ গিয়ে চাকখানা কাৎ হবার উপক্রম হতেই আবার ধাক্কা। পরে সে চাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে থাকল। চাকা কাৎ না হতেই আবার ধাক্কা। রাস্তা যেখানে ঢালু এবং মসৃণ, সেখানে চাকার গতি-বেগ এত বেশী হলো যে, ছেলেটার পক্ষে চাকার সঙ্গে দৌড়ানো বেশ কষ্টকর হলো, কিন্তু এভাবে সে খুব অল্প-ক্ষণের মধ্যে বাড়ী পৌঁছে গেল।

ছেলেটার বাবা তো দূর থেকে এই ব্যাপার স্যাপার দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। তার মাও স্বামীকে অনুসরণ করল। মরা কাঠ প্রভৃতি বস্তুতে নিতান্ত জিন ভূতের প্রভাব না থাকলে কি তা দৌড়তে পারে? এই ছিল তাদের ধারণা। স্বামী-স্ত্রীর কে কতোটা বেশি হাঁ করে চিৎকার করতে পারে এ যেন তারই প্রতিযোগিতা। কিন্তু চিৎকার শুনে মানুষ তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না আর। তাই মায়েরা সব ছুটে এলো ব্যাপার-স্যাপার কি, তা দেখতে। সবাই তো অবাক। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে সকলে মোটামুটি একমত হলো—না, এতে ভয় পাওয়ার তেমন কিছু নেই। তোমরা সেখানে থাকলে নিশ্চয় তাদের আচ্ছা করে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে। কিন্তু সেই সময়ের কথা একবার চিন্তা কর। সেই যুগটাই ছিল যে ঐ রকম। যা হোক, চাকা উঁকি দেবার পর থেকেই মানুষের সমাজে শুরু হলো চাকার ব্যবহার। আর তার থেকে মানুষ উপকার পেতে লাগল।

তখন আর কাঠ মিস্ত্রীর বাড়ি থেকে চাক আনবার জন্য আর কেউ সেটা ঘাড়ে করে আনত না, গড়িয়ে আনত। এবং সেটাই ছিল সহজ উপায়। বাচ্চা ছেলেরা ছোট ছোট চাকা বানিয়ে দিনরাত খেলায় মেতে থাকত। চাকা গড়িয়ে অথবা চাকা ঘুরিয়ে তারা খেলা করত। সময়ের রাস্তা ধরে চাকাও গড়িয়ে চলল।

সেই যুগেই আস্ত কাঠের তৈরী চাকা বসিয়ে গাড়ী বানানো হলো। সেই গাড়ী খচ্চর বা ঘোড়ায় টানতো। টুকরো টুকরো কাঠে তৈরী নয় বলেই সেই গাড়ীর চাকা ছিল বেশ ভারী। খুব সহজে চালানো যেত না। মানুষও নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করল আর এই ভাবে একদিন পাতি —অর্থাৎ পাতলা টুকরো কাঠযুক্ত চাকা বেরিয়ে এল মিশর ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ সিরিয়া থেকে, অবিকল আজকের দিনের গরু ও ঘোড়ার গাড়ীর চাকার মতো। কিন্তু শক্ত কাঠের অভাবে এ চাকা তেমন মজবুত না হওয়ায় এ চাকাও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারল না।

এতক্ষণে হয়তো তোমরা অনেকেই অধৈর্য হয়ে পড়েছ। সাইকেলের কথা বলতে গিয়ে চাকা আর ঘোড়ার গাড়ী দিয়ে আমি তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছি। আসলে তা নয়। গাছের পাতা ধরে টানলে ডাল পালা যেমন এগিয়ে আসে তেমন সাইকেলের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই চাকা এসে পড়ে। সাইকেলেরর জন্মতো চাকা থেকেই। চাকা তো ঘোড়ার গাড়ী কিংবা গরুর গাড়ীরও ছিল। তাই গোরুর গাড়ীর কথা একটু বলতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে চাকাকে মেজে ঘষে আরো মজবুত করার চেষ্টা

চলল। রোম দেশেই সর্বপ্রথম ঘোড়া গাড়ী ও ঠেলা গাড়ীতে লোহা-লক্কড় যুক্ত মজবুত কাঠের চাকা ব্যবহার করা হলো। আর এই ভাবে চাকার ব্যবহারই সাইকেল আবিষ্কারের রাস্তা তৈরি করে দিল।

এবার তোমাদের সাইকেলের আদি পুরুষের কথা বলবো। সে এক আজব ব্যাপার। সাইকেলের কুষ্ঠি ঠিকুজী খোঁজ করতে গিয়ে রোমে পৌঁছুতে হয়। রোম সভ্যতা অনেক প্রাচীন। সেই প্রাচীন কালেই সাইকেলের জন্ম হয়। কিন্তু সে সাইকেলের চেহারা দেখলে আজকের মানুষ হেসে উড়িয়ে দেবে। সে কথা ঠিক। একটা সুদর্শন মানুষকে দেখে তার কঙ্কালটা চেনা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কালের সাইকেল বানাবার কায়দা-কানুন ও ব্যবহারের নিয়ম-রীতির সঙ্গে আধুনিক সাইকেলের মিল যে একটুও নেই সে কথা বলব না। সেই সাইকেলের ছিল তিন চাকা। তাই বলে রিকৃশা ভেবে ভুল করো না যেন। দু-খানা চাকা সামনে আর একখানা পেছনে। একেবারে আজব ব্যাপার। হাতল যুক্ত সেলাই মেশিনের মতো সামনের দু-চাকায় থাকতো দুটি হাতল। আর পেছনের চাকার উপর থাকত একটা পুরু গদি। তার উপর সওয়ার হতেন আরোহী। সামনের দু'চাকার উপর থাকত আড়া-আড়ি এক লম্বা তক্তা, তার উপর দু-জন বসে হাতল ঘোরাতো। খুব ধীরে চলতো সে সাইকেল। তাতে কি হয়েছে। খুব সামান্য অবস্থা থেকেই তো শুরু হয় ভবিষ্যতের জয়যাত্রা। একটা পরিণত মানুষেরও শৈশবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা অবস্থা থাকে। সাইকেলেরও সেদিন ছিল নিতান্ত ছেলেবেলা। আর সেই ছেলেবেলার গল্প শুনলে কার না হাসি পায় বলো?

কিন্তু এ সব সাইকেল ব্যবহার করতো কারা জানো? শুধু মস্ত ধনী আর বিলাসী লোকেরা এ জাতের সাইকেলে চড়ে তাদের স্বচ্ছল অবস্থার বিজ্ঞাপন দিয়ে গরীব জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিত যে, তারা বড়লোক। এই সব সাইকেল চালাতে অতিরিক্ত দুজন লোকের দরকার হতো, শুধু তাই নয় অতিরিক্ত কিছু পয়সারও। গরীব স্তরের মানুষেরা এত পয়সা পাবে কোথায়? তারা গরু-ঘোড়া কিংবা ঠেলাগাড়ী ব্যবহার করতো।

তোমাদের কল্পনার কলম দিয়ে সেই উদ্ভট সাইকেলের ছবি আঁকার চেষ্টা করতো, যার তিনখানা চাকা হলো মস্ত কাঠ অথবা লোহার তৈরি।

সামনের দু-চাকায় আছে হাতল, সবটা মিলিয়ে এত ভারী যে, এক ইঞ্চি নাড়াতেও হিমসিম খেতে হয়। তারপর সাইকেলের মনিব পেছনের গদিতে জয়ঢাকের মতো এক ভুঁড়ি নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, আর দু'জন লোক সামনের চাকার তক্তায় বসে শরীরের সমস্ত শক্তি নিংড়ে দিয়ে হাতল ধরে চাকা ঘুরানোর কসরৎ করছে। কিছুক্ষণ পর পর লোক বদলানো হচ্ছে। আর এত কাণ্ডের পরও সেই তিন চাকা যানের শম্বুক গতি পায়ে হাঁটা মানুষেরও পেছনে পড়ে থাকত। হঠাৎ যদি নামাবার প্রয়োজন হয়—তা হলে দু'-তিনজন বাড়তি লোক গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দেবে। এত সব অসুবিধের মধ্যেও এই তিন চাকা যানটি সাইকেলের পূর্বপুরুষ হিসেবে দীর্ঘকাল যাবৎ পম্পাই, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রচলিত ছিল।

এবার তাহলে এই সাইকেলের একটা নামকরণ হোক। আজকাল তো কতো নামের কতো রকম সাইকেল দেখা যাচ্ছে, যেমন র‍্যালে, হারকিউলিস, ফিলিপস, প্রিন্স, ফণিক্স, ফ্লাইং, পিজিয়ন ও আরও কতো। এ সবের বুড়ো দাদারও তো একটা নাম থাকা চাই। কিন্তু নামটা দেবে কে? মনে করো ওর নাম 'হস্তচালিত সাইকেল।' হস্তচালিত তাঁত নামে একটা জনপ্রিয় শব্দ আছে। 'লোকটানা' বা লোক ঠেলা নামটা খুব একটা সুবিবেচনার হবে না। কারণ লোকেরা তো সাইকেলের উপর সওয়ার হয়। মনিব ও দুই চাকর তারা তিনজনেই ছিল সাইকেলের আরোহী।

এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আরও কিছু সময় কেটে গেল। সাইকেলের উন্নতি নিয়ে হরেক রকম প্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রায় পাঁচশো বছর আগে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী—নাম তার কি জান? ভি সুরাক। তিনি একটা কাণ্ড করলেন। ধাতুর তৈরি ছোট ছোট দুটো চাকা আগু-পিছু রেখে একটা বড় রড বা ডাণ্ডা দিয়ে জুড়ে দিলেন। দু-চাকার মাঝখানে সেই রডের চেয়ে একটু উঁচুতে ছিল বসার জায়গা। আর পা দুটো রাখতে হতো মাটিতে। তারপর লগি দিয়ে নৌকা চালানোর মতো মাঝে মাঝে মাটিতে পায়ের ধাক্কা দিয়ে সেই সাইকেল চালাতে হতো, কারণ সাইকেল চালানোর প্যাডেল তখনও ধরা দেয় নি।

ডি সুরাকের সাইকেল দূর থেকে দেখে মনে হতো যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। কারণ এর প্রধান ত্রুটি ছিল দুটি। প্রথমত দিক পরিবর্তনের কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। মোড় ঘোরাবার প্রয়োজন হলে সাইকেল থেকে নামতে হতো। তারপর নিতান্ত নিরীহ মানুষটির মতো সাইকেল খানা দু-হাত দিয়ে উঁচু করে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার তাতে চড়তে হতো। আর একটা কথা, ডি. সুরাকের সাইকেলে ব্রেক ছিল না। ঢালু রাস্তায় সাইকেলের গতিবেগ এমনিতেই খুব বেড়ে যেত। তখন দরকার পড়লেও থামানো যেত না। আর এই অবস্থায় আরোহীকে বারবার রাস্তায় মাটিতে পায়ের চাপ দিয়ে থামাতে চেষ্টা করতে হতো। নয়তো

তাকে চলন্ত সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সাইকেলকে টেনে রাখতে হতো। ব্যাপারটা শুনে তোমাদের খুব হাসি পাচ্ছে, তাই না? খুব সামান্য অবস্থা থেকেই তো শুরু হয়েছিল সাইকেলের জয়যাত্রা। এত সব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ডি. সুরাকের সাইকেল ঘরে ঘরে আদৃত হয়েছিল। আর ছেলে-ছোকরাদের তো কথাই ছিল না। ফরাসী দেশে পনেরো শতকের শেষ দশক পর্যন্ত এই সাইকেলের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে এ জাতীয় সাইকেলের জনপ্রিয়তা খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। শুধু তাই নয়, সাইকেলের এই আদি পুরুষের ভাগ্যে অনেক ব্যাঙ্গ বিদ্রূপও জোটে। অনেকেই ওর নাম দিয়েছিল 'ওয়াক্ অ্যালং' অর্থাৎ সাথে সাথে হাঁট!

তারপর দুশো বছরের বেশি হয়ে গেল অথচ সাইকেলের দিকে লোকের তেমন একটা নজর পড়ল না। 1731 সালের কথা, ন্যারেনবার্গের এক কর্মকার জিনমার্ক আবিষ্কার করলেন হ্যাণ্ডেল। তিনি সামনের চাকার উপর দুটি দণ্ড জুড়ে দু'চাকার সংযোগকারী দণ্ডের মধ্যে দিয়ে হ্যাণ্ডেলের সাথে জুড়ে দিলেন। এর ফলে আরোহী ইচ্ছে মতো সাইকেল ঘোরাতে পারত আর চলতি অবস্থায় পড়বার ভয়ও অনেকটা কমে গেল। হ্যাণ্ডেলের আবিষ্কারে সাইকেল চালানো সহজ হয়ে উঠল। সময়ের সিঁড়ি দিয়ে সাইকেল আরও একধাপ উপরে এগিয়ে গেল।

সামান্য একটা ঘটনা থেকে অনেক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূত্র পাওয়া গেছে। একবার এক আন্তর্জাতিক ছবি-প্রদর্শনী হলো। হাজার হাজার দর্শক উপচে পড়ল ছবি দেখতে। দর্শকদের একজন ছিলেন ক্রেমুরের এক কারখানার মিস্ত্রী। নাম, এম. নিসফি। একটা ছবির সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ছবিতে আছে, একটা ছোট্ট মেয়ে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। নিসফি চিত্র-রসিক ছিলেন না। কিন্তু ছবির সাইকেলের মধ্যে তার দু চাকার সংযোগকারী দণ্ডটি তাঁকে আকর্ষণ করছিল।

বাড়ীতে এসে নিসফি এক সাইকেল তৈরি করলেন। তার হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে নীচের দিকে লম্বা দুটি দণ্ড জুড়ে তা সামনের চাকার মাঝ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন সেখানে জুড়ে দিলেন দুই প্যাডেল। ঐ দণ্ড দুটো ছিল উপর দিকে ঢিলে, যাতে প্যাডেলের সাহায্যে সেগুলোকে সহজে আগে-পিছে নাড়ানো যায়। তারপর তিনি ঐ দণ্ডের মাথায় দুটো লম্বা তার জুড়ে পেছনের চাকার দু'ধার দিয়ে নিয়ে তার কেন্দ্রস্থলে ঘুর-প্যাঁচ দিয়ে একফুট লম্বা আর এক দণ্ডের সাথে জুড়ে দিলেন। তারপর সীটের উপর বসে প্যাডেলে চাপ দিতেই সাইকেল ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। যদিও তার গতি ছিল ধীর কিন্তু সত্যিকার দৃষ্টিতে এটা ছিল যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার। কারণ মাটিতে পা দিয়ে নৌকো চালানোর চেয়ে প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে চলতে পারা কি গৌরব বা আনন্দের বিষয় নয়?

এদিকে পিয়ারী লাল মিণ্টো নামে এক ফরাসী কারিগর সাইকেলে ব্রেক ব্যবহার করলেন। তাই বলে সেটা কিন্তু এখনকার ব্রেকের মতো উন্নত ছিল না। পিয়ারী লাল কি করলেন জানো? তিন ফুট লম্বা এক লোহার শেকল নিয়ে তাতে এক আংটা জুড়ে দিলেন হ্যাণ্ডেলে বেঁধে। শিকলের নীচের মুখে জুড়লেন এক খাঁজকাটা লোহার পাত। তারপর সেই নীচের অংশকে এমন-ভাবে সামনের চাকার সাথে জুড়ে দিলেন যে, উপরের আঙটা ধরে টানতেই খাঁজকাটা লোহা চাকার গায়ে চেপে বসত, ফলে সাইকেল মুহূর্তে থেমে যেত।

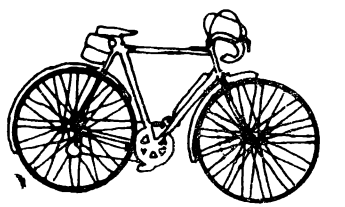

আধুনিক কালের অন্যতম যান সাইকেল

একটি বীজের আত্মকথা

তপন দোলুই

আমি বীজ। আমি জন্ম দিই ছোট্ট ঘাস থেকে শুরু করে বিরাট গাছের। আমি আমার ঘুমন্ত শিশুকে নিজের মধ্যে ধরে রাখি। মা যেমন নিজের শিশুকে দুধ খাওয়ায় আমিও তেমনি নিজের খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের পর উপযুক্ত আলো বাতাসের উপস্থিতিতে আমার শিশু আমার কোল থেকে আরেক মায়ের কোলে আসে। এই মায়ের নাম হল মাটি। সব মা যেমন নিজের শিশুর জন্য চিন্তা করেন তেমনি আমি আমার শিশুকে যতক্ষণ না স্বাবলম্বী হয় ততক্ষণ খাদ্য যোগান দিই। প্রথমেই আমার দেহ থেকে ভ্রূণমূল বের হয় তাতে জানান যে দেয় সে অন্য মায়ের কোলে যাবে। তারপর হয় ভ্রূণমুকুল। ভ্রূণমূল থেকে হয় প্রধান মূলও তার সহ-যোগীরা এবং ভ্রূণমুকুল থেকে হয় কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফুল, ও ফল। প্রকৃতির বুকে আমার শিশুরা স্বাবলম্বী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। তখন আমার কি আনন্দ, তবে দুঃখও হয়, যেমন সব মায়ের নিজের শিশুকে ছেড়ে দিতে দুঃখ হয়। তবে তোমাদের কথা ভেবেই আমার এই ত্যাগ স্বীকার করা না হলে প্রকৃতি এমন সুন্দর সাজে ফুলে ফলে ভরে উঠত না। আমার কথা শেষ। এবার তাহলে আসি।

ডলফিন

অমিত ভট্টাচার্য

আমাদের কাছে ডলফিনরা বরাবরই আকর্ষনীয়। আর দুষ্টু, মিষ্টি ডলফিনরাও আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য সদাই উন্মুখ। অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে ডলফিনরা পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণীদের শ্রেণীতে পড়ে। এদের বুদ্ধি প্রায় মানুষের মতো, তাদের চেয়ে বেশী তো কম নয়। প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করতেন যে কোটী কোটী বছর আগে এরা মানুষই ছিল। এবং স্থল ভূমিতেই বাস করত। ক্রমে ক্রমে তারা শরীরের ধাঁচ সম্পূর্ণ বদল করে মাছের রূপ ধারন করে সমুদ্রবাসী হয়েছে।

তিমি গোষ্ঠির ছোট শরিক ডলফিন দেহগড়নে প্রায় তিমির মতই, কেবল আকারে ছোট। অবশ্য ঘাতক তিমিদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য বেশী কিন্তু এরা মোটেই ঘাতক তিমির মত হিংস্র নয়। তিমিরা সবাই সমুদ্রের বাসিন্দা কিন্তু ডলফিনরা সাগরে পড়েছে,—এমন নদীতেও বাস করে। ভারতের সাগর-বাড়ি ও নদী, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন ও রায়ো-ডি-প্লাটা এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীতে এদের ঝাঁক বেঁধে থাকতে দেখা যায়। ডলফিন সাধারণত 6 থেকে 8 ফুট লম্বা হয়। মুখে ধারাল ছোট ছোট দাঁত, সংখ্যায় 160 থেকে 200। পিঠের উপরের রং কাল, তলার দিক সাদা। চ্যাপ্টা ধরনের ঠোঁট ইঞ্চি ছয়েক লম্বা। কানের ফুটো ছোট। মাথার উপর নিশ্বাস ফেলার অর্দ্ধচন্দ্রাকার ফুটো, তাতে ভাল্‌ব থাকায় জল ভিতরে প্রবেশ করেনা। মাঝে মাঝে ডলফিনরা জলের উপর মাথা জাগিয়ে সশব্দে নিশ্বাস ফেলে। এরা খুলির মধ্যকার অংশে বাতাস বইয়ে দিয়ে নানারকম আওয়াজ সৃষ্টি করে। কপালের কাছে—একটি বধির "লেন্স" এই শব্দগুলি ফোকাস করে। প্রতিধ্বণি সম্পর্কে এরা এতই সজাগ যে জলে একটা পাথরের টুকরা পড়লেও টের পায়। এরা স্তন্যপায়ী প্রাণী। স্ত্রী ডলফিন একবারে একটি বাচ্চা প্রসব করে। সন্তানের প্রতি মা-ডলফিনের প্রবল আকর্ষণ।

উত্তমরূপে প্রশিক্ষণ দিলে ডলফিনরা দারুণ খেলা দেখাতে পারে, যেমন, শরীরকে দুমড়ে মুচড়ে লাফালাফি করা, চক্কর খাওয়া, গোত্তা খাওয়া, জল ছোঁড়া ইত্যাদি। সর্ফবোর্ডের উপর কুকুরকে টেনে তুলতে বা বাসকেট বল খেলতেও পারে।

ডলফিনরা নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে। মানুষেরা এদের কাছাকাছি এলে ডলফিনরা নিজেদের নাক জল থেকে বের করে অদ্ভুত শব্দ করে। সম্ভবত তারা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বৈজ্ঞানিকরা তাদের 'ভাষা' নিয়ে গবেষণা করছেন যাতে তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া যায়। তাছাড়া শব্দাতিগ (Supersonic) বায়ুতরঙ্গ সৃষ্টি করে জলের মধ্যে দিয়ে দূরে অন্য ডলফিনের কাছে সংবাদ পৌঁছে দিতে পারে। বন্ধু ডলফিনদের মারফৎ সাগর পাড়ি দিয়ে দূরে কোন বার্তা পাঠানো ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহন করিয়ে আনাও হয়তো সম্ভব হতে পারে। দৌত্যকাজে তাদের ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

প্লিনি বলেছেন, ডলফিনরা নীলনদের উজানের দিকে উঠে যায়। নীলনদের কুমির মানুষের শত্রু। ডলফিনরা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে ছাড়ে না। এযেন বন্ধুর হয়ে তার শত্রুকে প্রতিরোধ করা। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ধীবরদের মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, মাছ ধরার সময় তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য নরমাংসলোভী হাঙ্গর-দের তারা আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়।

উন্মুক্ত মাছ ঘরে (Outdoor aquarium) ডলফিন দর্শকদের বিশেষকরে শিশু ও কিশোরদের প্রিয় দ্রষ্টব্যে পরিণত হয়েছে। হংকং, ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর-নিয়ার অ্যাকোয়ারিয়ামে ডলফিনরা মানুষের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয়। ছোটদের সঙ্গে খেলায় আমোদ পায়। তাদের মুখে 'লাগাম' লাগিয়ে তা ধরে পিঠের উপর দাঁড়ালে তারা সানন্দে সওয়ার নিয়ে জল-দৌড় বাইচখেলা দেখায়।

সাগরের প্রাণী সবাই যখন স্থলচর মানুষের শত্রু, সাহসী বুদ্ধিমান, ক্ষিপ্রগতি, একতাবদ্ধ, ডলফিন বন্ধুরা যে সমুদ্রচারী মানুষের কাছে প্রিয় হবে তাতে আর সন্দেহ কি ?

A.—8/279 কল্যাণী, পোষ্ট কল্যাণী, নদীয়া

বোর্নিওর বেরী

সঙ্কর্ষণ রায়

॥ চার ॥

দিন দুই বাদে সন্ধ্যাবেলায় সুবীর ও করবী নিজেদের শোবার ঘরে ব'সে কফি খাচ্ছিল। ল্যাবোরটারির দোতলায় একটি ফ্লাটে ওরা থাকে। ল্যাবোরেটারির চারপাশে বাগান, বাগানের পূর্ব দিকে সমুদ্র। শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সুবীর বললে, 'বাগানের এই গাছগুলো কি রকম বেড়ে গিয়েছে দেখেছ। আরও একটু বাড়লেই সমুদ্রকে আড়াল করে দেবে।'

'খুব বাড় বেড়েছে ওদের !' করবী মৃদু হেসে বললে।

'সব তো তোমারই গাছ। কি রকম আগাছার মত বেড়ে যাচ্ছে তোমার রিসার্চ তো শেষ হয়েছে, এবারে এদের শেষ ক'রে দাও।'

'কি যে বল তার ঠিক নেই। আমার রিসার্চ শেষ হয়েছে ব'লে এই গাছগুলোকে শেষ ক'রে দেব !'

'এগুলো তো গাছ নয়, আগাছা। আগাছা তো কেটেই ফেলা উচিত।'

'আগাছা কে বললে, রীতিমত গাছ এরা। গায়না, সেনেগল, আন্দামান, বোর্ণিও ও নিউগিনি থেকে আনা ফুল-ফলের গাছ। বিভিন্ন দেশের গাছ, এখানকার মাটিতে কি রকম চমৎকার গজিয়েছে দেখ।'

'এদের মধ্যে তো বোর্ণিওর বেরী আছে। খুব বেড়ে গিয়েছে গাছটা, তাই না ?'

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত অন্ধকারের কালো পর্দা সমুদ্র থেকে শুরু করে বাগান পর্যন্ত সব কিছু চাপা দেয়। সমুদ্র এখানে খুবই শান্ত, সমুদ্রের তর্জন-গর্জনের লেশমাত্রও শোনা যাচ্ছে না। চারদিক নিস্তব্ধ।

হঠাৎ নিস্তব্ধতার বুক চিরে ঝিঁঝিঁপোকার ঐক্যতান শুরু হয়ে যায়। খুবই কর্কশ শব্দ, যেন একসঙ্গে অনেকগুলো ক্যানেস্তারা বাজানো হচ্ছে। কান পেতে খানিকক্ষণ শোনার পর সুবীর বললে, 'মনে হচ্ছে তোমার গাছগুলোর মত এরাও বিদেশী।'

'ঠিকই বলেছ। করবী বললে, 'এখানকার ঝিঁঝিঁ-আওয়াজ এমন কর্কশ হয় না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার ! গাছপালার বীজের সঙ্গে ঝিঁঝিঁ-পোকার ডিমও কি বিদেশ থেকে চলে এসেছে !'

'আসতেও পারে।'

'দেশী না বিদেশী বুঝবে কি করে ?'

'আওয়াজ যাচাই করে বোঝা যেতে পারে। দাঁড়াও, ক্যাসেটে তুলে নিই ...

বলে ক্যাসেট্ রেকর্ডারটা জানালার ধারে এনে চালু ক'রে দেয় করবী।

মিনিট কয়েক বাদে ঝিঁঝিঁ পোকাদের ঐক্যতানের পাশাপাশি আর একটা আওয়াজ শোনা যায়, অস্পষ্ট একটা কণ্ঠস্বর। অন্ধকারের মধ্যে চোখে কিছু দেখা না গেলেও বোঝা যায়, কে একজন বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। তারই গলার স্বর।

'বাগানের মধ্যে কি ওটা বল তো ?' করবী প্রশ্ন করে।

'তা তো জানি না।' সুবীর জবাব দিল, 'শুধু এইটুকু জানি, মানুষ নয়।'

অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে জানোয়ারটা জানলার ঠিক নিচে এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হ'ল।

এমন সময় ওখানে টর্চের আলো এসে পড়তেই জানোয়ারটা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরমুহূর্তে শোনা গেল বাগানের মালি জগন্নাথের আর্তনাদ ঃ বাঁচাও বাঁচাও... মেরে ফেললে আমাকে

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নিচে নেমে এল সুবীর ও করবী। তাদের

ফ্ল্যাটের জানালার নিচে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থর-থরিয়ে কাঁপছিল জগন্নাথ, তারা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে আর্তস্বরে বললে, 'ভূত...কালো ভূত আমার গলা টিপে ধরেছিল...

কোথায় ভূত ? চারদিকে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে প্রশ্ন করে সুবীর।

'বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে হুজুর—আমার চিৎকার শুনেই হাওয়া হ'য়ে গিয়েছে !

করবী বললে, 'ভূত বলে কিছু নেই, একটা জানোয়ার বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিল, আমাদের ফ্ল্যাটের জানালার নিচে এসেও দাঁড়িয়েছিল—

সুবীরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে গাছটার ওপরে আলো ফেলে সে বললে, 'দেখছ, গাছটার ডালপালা ভেঙ্গে দিয়ে গিয়েছে ঐ জানোয়ারটা।'

টর্চের আলোয় গাছটাকে পরীক্ষা করতে করতে করবী বললে, 'এটাই বোর্ণিওর বেরী।'

'এই গাছটাই ছিল জানোয়ারটার টারগেট !' সুবীর বললে, 'গাছটার লোভেই এসেছে এই বাগানে, ডালপালা ভেঙ্গে তছনছ করছে। ফুল ফলের সঙ্গে পাতাও খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে...

'জানোয়ারটা তা হলে ডক্টর হার্ট্জ-এর ওরাং ওটাং। বোর্ণিওর বেরী গাছের টানে চলে এসেছে আমাদের বাগানে ! মনে হচ্ছে বাগানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ! বলতে বলতে কেঁপে ওঠে করবীর গলার স্বর।

জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে সুবীর বললে, 'বুঝলে ভাই জগন্নাথ, ওটা একটা বনমানুষ। তোমাদের দিদিমণি মনে করেন, জানোয়ারটা এই বাগানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।'

'বলেন কি হুজুর। জগন্নাথ আর্তনাদ করে ওঠে : 'আমি তা হলে আমার ঘরে যাই...'

'ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরিয়ে আসবে। আজ রাত্রে দারোয়ান ভীম সিংহের সঙ্গে তুমিও পাহারা দেবে বাগানের মধ্যে...

অনেক রাত্রে সুবীরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। অন্ধকার ঘর ফুলের গন্ধে ভরে আছে। ঘরের মধ্যে ফুলদানি থাকলেও ফুল নেই। বাগানের মধ্যে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তা এই ঘরের মধ্যে এল কি করে ভেবে পায় না সে। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছে ?

না স্বপ্ন নয়, সত্যি। গন্ধটা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ঘরের অন্ধকার যেন নড়াচড়া করতে শুরু করে। পরমুহূর্তে চিৎকার করে ওঠে করবী।

বেড্-সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। আলো জ্বলতেই অদৃশ্য হল অন্ধকারের নড়াচড়া, মিলিয়ে গেল ফুলের গন্ধ।

বিছানার ওপরে উঠে বসেছে করবী, তার চোখ দুটি বিস্ফারিত।

'বনমানুষটা ঘরে ঢুকেছিল জানালা দিয়ে।' করবী বললে।

'বাগানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে এ ঘরে ঢুকল কেন ? বেরী ফল কুড়িয়ে এনে ঘরের মধ্যে রাখ নি তো ?'

'হর্টিকালচারিস্ট ভেম্বন ভেতরে স্টোর রুমে এনে রেখে-ছিল কাল। তার গন্ধে গন্ধে হয়তে এসে গিয়েছিল...'

'সব বাঁদুরে কাণ্ডকারখানা আর কি ! দাঁড়াও, কৃষ্ণরাওকে ফোন করে তার চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে আসা বনমানুষ-টাকে ধ'রে নিয়ে যেতে বলি।'

'তার আগে তোমার দারোয়ান ও মালির খবর নাও। দেখ ওরা বেঁচে আছে কিনা...

এই গাছটাই ছিল জানোয়ারটার টারগেট......

বিছানা থেকে উঠে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল, সুবীর। চিৎকার করে ডাকল, 'ভীম সিং, জগন্নাথ...

উত্তরে শোনা গেল পেঁচার চ্যাঁচানি এবং রাত্ জাগা অন্য কোন পাখির ডানার ঝটপটানি।

সুবীর বললে, 'মনে হচ্ছে দুজনেই যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছে। সকাল হ'লেই দূর করে দেব ওদের।

করবী বললে, 'তোমাকে আর দূর ক'রে দিতে হ'বে না, ওরা নিজেরাই হয়তো দূর হয়ে গিয়েছে বনমানুষের তাড়া খেয়ে। অবশ্য, বনমানুষের হাতে খুন হ'য়েও যেতে পারে।

'যাই, নিচে গিয়ে দেখি....'

'না। সুবীরের হাত ধ'রে করবী বললে 'ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা কর...

ভোর হতেই নিচে নেমে এল ওরা। বাগানের মধ্যে এসেই পেয়ে গেল ওরা ভীম সিং ও জগন্নাথকে। ওরা দুজনেই একটি জামগাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে ওদের জ্ঞান ফেরাতে পারলেও সাহস ফেরাতে পারল না সুবীর। জ্ঞান ফিরতেই ওরা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে আর বলে, আমরা কাজ ছেড়ে দেব, দেশে যাব। বনমানুষের মার খেয়ে আমরা চাকরি করতে পারব না!'

'তুমি না পালোয়ান ভীম সিং।'

বিদ্রুপব্যঞ্জক স্বরে বললে সুবীর, 'তোমাদের বস্তি জেলার সেরা পালোয়ান নাকি তুমি! সামান্য একটা বনমানুষের মার খেয়েই কাবু হ'য়ে পড়েছ।'

'সামান্য বনমানুষ কাকে বলছেন হুজুর!' কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বললে ভীম সিং, একটা রাক্ষুসে জানোয়ার! মিশ-কালো, লম্বা-চওড়া, চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। ওর এক ঘুষিতেই আমার মত পালোয়ান অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বিবেচনা ক'রে দেখুন কি সাংঘাতিক ওর গায়ের জোর...'

ল্যাবোরেটারিতে এসে সুবীর মানকি এ্যাণ্ড এইপ্ পার্কের কেয়ারটেকার কৃষ্ণরাওকে ফোন করল। উত্তেজিত স্বরে সে বললে, আপনার পার্কের বনমানুষ আমাদের ল্যাবরে-টারির বাগানে হামলা করেছে গত রাত্রে। বাগানের গাছ-পালা তছনছ করা ছাড়া বাগানের মালি ও দারোয়ানকে ঘুষি মেরে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছে। তা ছাড়া পাঁচিল বেয়ে দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল আমাদের শোবার ঘরে!'

'কি যে বলেন তার ঠিক নেই!' কৃষ্ণরাও বললেন, 'আমার সব কটা জানোয়ারই পার্কের মধ্যে আছে। বাঁদর-হনুমানগুলো পার্ক ছেড়ে কোথাও যায় না, কারণ এখানে ওদের খাদ্যের কোন অভাব নেই। বনমানুষগুলো আছে খাঁচার মধ্যে....

'না নেই।' কৃষ্ণরাওয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে সুবীর। আপনি খাঁচাগুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখুন, অন্ততঃ পক্ষে একটা বনমানুষ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এখানে চলে এসেছে...'

'আমি এইমাত্র সবকটি খাঁচায় রাউণ্ড দিয়ে এসেছি, প্রত্যেকটা বনমানুষ তার নিজের খাঁচায় আছে।'

'ডক্টর হার্ট'জ-এর ওরাংওটাং? সেও কি আছে তার খাঁচায়?

'খাঁচায় না থাকলেও সে যথাস্থানে, মানে ডক্টর হার্ট'জ-এর ঘরে আছে। গতকাল সন্ধ্যায় ডক্টর হার্ট'জ কন্যাকুমারী থেকে এসেছেন, এসেই তিনি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছেন।'

তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেও ঘর থেকে পালিয়ে সে আমার বাগানে এসেছিল। আমার মনে হচ্ছে সে এখানে লুকিয়ে আছে এখানে....'

'একটু আগেই আমি তাকে ডক্টর হার্ট'জ্-এর ঘরে দেখেছি। ডক্টর হার্ট'জ্ তাঁকে মধু-মাখানো পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছেন। শুনুন ডক্টর সিন্‌হা, ডক্টর হার্ট'জ-এর ওরাং-ওটাং নয়, অন্য কোন বনমানুষ ঢুকেছে আপনাদের বাগানে। আপনি যদি চান, আমি তাকে ধরে আনতে পারি...আমার চিড়িয়াখানায় জায়গা আছে...'

'কি ব'লে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে মিস্টার রাও...

ধন্যবাদ আমিই আপনাকে দেব যদি বনমানুষটাকে ধরে আনতে পারি আপনার বাগান থেকে—এই চিড়িয়াখানাটাকে বনমানুষ ও বাঁদরদের পূর্ণাঙ্গ চিড়িয়াখানা করতে চাই। আধঘণ্টার মধ্যেই আমি আমার এখান থেকে একজনকে পাঠাচ্ছি বনমানুষটাকে ধ'রে আনার জন্য... [চলবে]

ফেরোমনের কারসাজি

নারায়ণ দাশ

ঝির ঝির করে বইছে দখিনা বাতাস। তির তির করে এগিয়ে আসছে একটা রঙীন প্রজাপতি। চোখ পড়ল বাপ্পুর। পড়া ফাঁকি দিয়ে কখন থেকে সে বসে আছে বাড়ীর রোয়াকটায়। অপেক্ষা করছে বাবার জন্য। বাড়ীর সামনেটা ফুলের গন্ধে মোঁ মোঁ করছে। মাধবীলতা-গুলো যেন হাসির ফুলঝুরি উড়িয়ে এ ওর গায়ে হেলে পড়ছে।

তাইতো, প্রজাপতিটা হাওয়ার উল্টো পথে পত্ পত্ করে উড়তে উড়তে যাচ্ছে কোন্ দিকে? উঠে দাঁড়াল বাপ্পু। প্রজাপতিটা এগিয়ে চলেছে ডালিয়ার উপরে বসে থাকা একটা প্রজাপতির দিকে। ভারী মজা তার। এবার তাহলে যুদ্ধ হবে ওদের ফুলের মধু খাওয়া নিয়ে। সাগ্রহে অনুসরণ করল প্রজাপতিটাকে। কিন্তু কই যুদ্ধ তো হোলই না, বরং কেমন যেন একমুহূর্তে ভাব হয়ে গেল ওদের। উড়ে আসা প্রজাপতিটা একেবারে ফুলের ঐ প্রজাপতিটার মুখোমুখি বসল, তারপর শুঁড় দুটো মেলে ধরল ওরই দিকে তাক করে। আস্তে আস্তে চুমু খাওয়ার মত আলতো করে স্পর্শ করল একটা জায়গায়। দ্বিতীয় প্রজাপতিটা কিন্তু এতে ভয় পেল না বা উড়েও গেল না বরং দুজনে ডানায় ডানা জড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ খেলতে লাগল। ভীষণ মজা করল ওরা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? ভাবতে লাগল বাপ্পু। খেলতে যেতে ভাল লাগল না। ফিরে এসে বসল একটা নিচের সিঁড়িতে। বাগানে হাজারো প্রজাপতির হুড়োহুড়ি উড়োউড়ি চলছে। কিন্তু কিছুতেই আগের ঘটনাকে মন থেকে সরাতে পারল না সে। বাড়ীর ভেতরে মা অবিশ্যি আছেন কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে তো তিনি উড়িয়েই দেবেন বরং উল্টে আরও বকুনি খেতে হবে বিকেলে পড়াটা ফাঁকির জন্য। কাকু বাইরের ঘরটায় দিব্যি পড়াশুনা করছে। সামনে নাকি ও'র পরীক্ষা।

এখন তাহলে ব্যাপারটা কাকে জিজ্ঞেস করা যায়। বন্ধুরা আবার ওকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে আধুনিক ডারউইন বলে। তাই এড়িয়ে চলে ওদের। এসব কথা আদৌ তোলে না ওদের সামনে। একমাত্র বাবাকেই বলা যায় ব্যাপারটা। তিনিই আসল মনের সঙ্গী। অগত্যা কিছুটা সময় তাকে চেপে থাকতেই হচ্ছে।

বাইরে একটু বেরিয়ে পড়ল সে। সামনের ইঁটের রাস্তাটা ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল পিচরাস্তাটার দিকে। একটু ভাল করে তাকাল বাবার কলেজটার দিকে, যদি দূরে তাঁকে দেখা যায়। পাশেই বুলাইদের আমবাগান। মন খারাপ লাগলে সে একা একা ওখানে গিয়ে বসে বাঁধানো চাতালটায়। সেখানের গাছপালা আর ছোট ছোট কত না জানা-অজানা কীটপতঙ্গগুলো হয়ে ওঠে ওর মনের সঙ্গী। কখন যে অবসর মুহূর্তটা শেষ হয়ে যায় বোঝাই যায় না। কিন্তু আজ আর ভাল লাগছে না। ঠিক আজকে মাতুটাও নেই। স্কুলে গেছে।

আরে, ঐ তো বাবা আসছে, বোনটার হাত ধরে। বুঝেছি ক্লাশ সেরে আবার ওকে আনতে গিয়েছিলেন স্কুলে, তাইতো এত দেরি। রাগ হ'ল এবার মাতুর উপর। কেন বাবা! অন্যদিনের মত তুই ত ছবিদির সঙ্গে আসতে পারতিস্। যাক্ গে বাবাকে একবার সুযোগ মত পেলে হয়। অবশ্য বাবাকে পাওয়ার মত ভাল কৌশলটাও জানে সে। একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

বাড়ীর বাগানের কাছে বাবা আসতেই সামনে এগিয়ে গেল সে। তারপর সোজা বাবাকে বলল—"আচ্ছা বাবা ঐ যে দুরন্ত দিয়ে বেড়াটা বেঁধেছো না, ওর নাম দুরান্তা রেপেনস্ তাই না? আর ঐ যে রঙ্গনটার ফুল ফুটেছে ওটা তো ইক্সোরা, তাই না? বাবা একটু হক্চকিয়ে গেলেন, সাইন্টিফিক নেম গুলো ও জানল কি করে?

বাবাকে আটকেছে দেখে মাতু বেশ বিরক্তই হয়েছে। কেননা তার এতক্ষণের আধিপত্যটা যেতে বসেছে। তাই সে বলল—কি সব বাজে বকছিস দাদাভাই, বাবাকে ছাড় এখন যেতে হবে না? ইতিমধ্যে মা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অগত্যা সবাইকেই আপাততঃ সব কিছু ধামাচাপা দিতে হোল। কারণ ওরা প্রত্যেকেই জানে,

এখন তার কথাই ফাইন্যাল। সুতরাং বাড়ীর ভিতরে চলো। বাবাও পা চালালেন সিঁড়ির দিকে।

সন্ধ্যে হতে আর দেরী নেই। বাবাকে ম্যানেজ করে বাগানে আনল বাপ্পু, সঙ্গে এক্সট্রা কাকু। মাতু তো বাবার পায় পায়। আর সুযোগ পেলেই কোলে উঠে বসবে। যাইহোক শেষ পর্যন্ত বিকেলের ব্যাপারটা বাপ্পু তুলে ধরলো বাবার কাছে। সব শুনে পাশ থেকে কাকু বললেন—দুর বোকা, ওটা তো ফেরোমনের ব্যাপার। এখন ওসব বুঝবি না। আমরাই বুঝতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, বড় হয়ে সব জানবি। কিন্তু মুশকিল হোল ইতিমধ্যে মাতুও ব্যাপারটা নিয়ে বেশ মাজা পেয়ে গেছে। কোথাও যেন রহস্য রহস্য গন্ধ আছে, তাই কাকুকে পাত্তা না দিয়ে বাবাকেই জড়িয়ে ধরল— বাবা, বল না।

অগত্যা পিতাকেও বাড়ীতে জুলজির ক্লাশ নিতে হোল। বাগানের যেখানটায় বসে আড্ডাটা গড়ে উঠেছিল ঠিক তার পিছনে, তিলাপিয়া চাষের অ্যাকুয়ারিয়ামটার পাড়েই তখন লং মার্চ করছিল একদল কাল কুচকুচে সৈনিক। বাবা সেই দিকেই ফিরলেন। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন --আচ্ছা বলতো, ঐ যে কাল পিঁপড়ের সারিটা চলছে,, দেখ কেউ কোন দিকে কিন্তু বাঁকছে না বা সরে যাচ্ছে না। আর একটু আধটু সরে গেলেও মাথা এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় ফিরে আছে। সবাই সামনের কর্তাকে ফলো করছে। ব্যাপারটা কি ?

—ও আবার কি ? সামনে পিছনে ঠেকিয়ে চলছে, তাই না বাবা। চট্ করে উত্তর দিল মাতু।

—থামত, তোর সব সময় পাকামি। ব্যাপারটা অত সহজ হলে আমিই বলে দিতাম।

বাবা চুপ করে থেকে বল্লেন—এবার দেখ। বলেই পিঁপড়ের সারির মাঝখানে একটু জায়গায় বার দুইতিন ঘষে দিলেন।

ব্যস, আর যায় কোথায়। পিছনের পিঁপড়েরা সব ঐ ক্রসিংয়ে এসে এগিয়ে চলার ব্যাপারটা তাল গোল করে ফেলছে। কিছুতেই এগুতে পারছে না, অনেকে এলোমেলো ভাবে আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছে, সব কিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আগেয় সারি অনেকটা এগিয়ে গেছে।

হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বাপ্পু আর মাতু। সেই সংগে বাপ্পুর অস্বস্তিটা আরও বেড়ে গিয়েছিল কেননা বাবা তার কথাটা এড়িয়ে গিয়ে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ এপাশ ও পাশ করতে করতে পিঁপড়ের লাইনটা আবার সোজা হয়ে গেল। বাবা বলে উঠলেন—দেখলে তো ব্যাপারটা। আসলে পিঁপড়েরা এই যে লাইন দিয়ে চলছে এর মূলে আছে পিঁপড়েদের দেহ থেকে নিঃসৃত এক

আচ্ছা, ঐ যে কালো পিঁপড়ের সারিটা চলছে...

প্রকার রস। একেবারে সামনে যে পিঁপড়েরা আছে তারা কোন অজানা পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় অতি অল্প পরিমাণে ঐ রস মাটিতে ছড়াতে ছড়াতে যায়। আর পেছনের পিঁপড়েরা ঐ রসের গন্ধ শুঁকে শুঁকেই লাইন ঠিক রেখে এগিয়ে চলে। ঐ যে আমি মাঝখানে ঘসে দিলাম, ওতে করে ঐ অংশের রসটা মুছে যাওয়ায় পিঁপড়েদের জ্যাম হয়েছিল পরে আবার ওরা নতুন করে রস ফেলে ফেলে ফাঁকটা পূরণ করেছে।

আর ধৈর্য্য রাখতে না পেরে বাপ্পু বাবাকে বলেই ফেলল —কিন্তু তোমার ঐ পিঁপড়ের ঐ লাইন করার সঙ্গে আমার প্রজাপতির সম্পর্কটা কি শুনি ?

—আরে সেটাই তো বলতে যাচ্ছি। প্রজাপতির ব্যাপারটাতেও একই ধরনের রসের ব্যাপার আছে। তুমি যে প্রজাপতিটাকে দূর থেকে উড়ে আসতে দেখলে ওটা আসলে পুরুষ প্রজাপতি আর ফুলের উপর যেটা বসেছিল ওটা স্ত্রী প্রজাপতি। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, স্ত্রী প্রজাপতি এবার ডিম পাড়বে তাই তার দেহ থেকে একরকম রাসায়নিক রস বাতাসে ছাড়ছিল তারই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঐ পুরুষ প্রজাপতিটা তার দিকে উড়ে উড়ে আসছিল।

— এতো সাংঘাতিক ব্যাপার, বলে ওঠে মাতু।

—শোন, এই ধরনের ঘটনা শুধু পোকামাকড়ের জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন উন্নত প্রাণী এমনকি মানুষের মধ্যেও দেখা যায়।

—মানুষের মধ্যেও, কেমন করে।

—হ্যাঁ,. বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন মানুষের মধ্যেও ভালবাসা, পরস্পরকে ভালবাসা বা দুজনের মনের

সাদৃশ্য ইত্যাদির মূলে ও নাকি এই ধরনের রস বা রাসায়নিক পদার্থের সম্পর্ক আছে।

—সে আবার কি? বাপ্পুর সবিস্ময় প্রশ্ন।

—ধরো, তোমরা যারা স্কুলে পড়ছ, দেখবে সকলের সংগে তোমাদের ভাব সমান নয়, তোমরা অনেকেই পাশাপাশি একই বেঞ্চে বসতে ভালবাস। হয়ত নতুন স্কুলে গেছ। দেখবে পরিচয় অনেক সময় না হতে হতেই কাউকে কাউকে তোমার ভাল লাগছে। আবার কাউকে একদম দেখতে পারছ না!

—সত্যিই কি বাবা তাই?

হ্যাঁ, আমাদের ছোটবেলায় একটা কথা বলি শোন, তাহলে দেখবে কথাটার অনেকটা সত্যতা আছে। গ্রামের বাড়ীতে আমাদের যৌথ পরিবার ছিল। তাতে মা, কাকীমা এদের সকলেরই, এক ধরণের কাপড় কিনে দেওয়া হোত, দুপুরের রোদে বেড়ায় কাপড় শুকোত। বিকেলে যখন মা বলতেন, যা তো কাপড়টা তুলে নিয়ে আয়। তখন আগে গিয়ে কাপড়ের গন্ধটা শুঁকতাম। যে কাপড়টার গন্ধ মায়ের গন্ধের মত মিষ্টি মিষ্টি লাগত ঠিক সেটাই মায়ের কাছে এনে দিতাম। মা তখন আমাদের চুমু খেতেন।

—এমা, বুড়ো ছেলেকে মা চুমু খায় নাকি? বলেই মাতু হাত তালি দিয়ে উঠল।

—ধ্যাত্, বাবা তখন তো আমাদের মতো ছিলো তোর যা মাথা না!

—আরে, শোনো শোনা, শেষ পর্যন্ত শোনই না। বলে বাবা আবার বলতে শুরু করলেন।—এক ধরনের ভালুক আছে যারা প্রস্রাব করে করে সীমানা চিহ্নিত করে রাখে। আর তার মূলেও হোল প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত এক প্রকার রাসায়নিক যৌগ। অন্য কেউ ঐ চিহ্নিত সীমানার মধ্যে ঢুকলে আর রক্ষা নেই, আমৃত্যু যুদ্ধ।

—আর কারুর এমন একটা চমৎকার কৌশল নেই?

—আছে বইকি, প্রায় প্রত্যেক প্রাণীরই আছে। যেমন মৌমাছি, কস্তুরী মৃগ, পিঁপড়ে, প্রজাপতি ইত্যাদি। তবে এদের প্রত্যেকেরই যোগাযোগকারী পদার্থটি রাসায়নিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এবং তা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ ও করে দিয়েছেন। এমন কি মানুষের কিছু ক্ষেত্রেও, ওগুলো বড় হলে জানতে পারবে। তবে এই যে একটা যোগাযোগের ভাষা, রাসায়নিক পদার্থ, বিজ্ঞানীমহলে সেটাই ফেরোমন (pheromone) নামে পরিচিত। অনেকে একে হরমোন নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

—আচ্ছা বাবা, এই যে বললে 'ভাষা' এর কোন সংকেত বা লেখা মাধ্যম নেই; জিজ্ঞেস করল বাপ্পুই।

—না, এই ভাষা আসলে বর্ণমালাহীনই বলতে পারো।

—দেখ বাবা, তোমার যুক্তিগুলো হয়ত সত্যি, কিন্তু তা বলে মানুষের বেলায় তার তো মনটা আছে, সেই তো সব কিছু ঠিক দেয়।

—হ্যাঁ, মন বলে একটা জিনিষ মানুষের আছে যা হয়ত অন্য কারুর নেই, কিন্তু এই মনটা কি জান? ওটা আসলে দেহের মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুর ক্রিয়া। তবে ওরও পেছনে এই ফেরোমন কত খানি কাজ করছে তা আমরা এক্ষুনি বুঝতে পারছি না।

ততক্ষন চুপচাপ বসে ছিল মাতু। তবে শেষের দিকে বাবা আর দাদা ভাইয়ের কথাগুলো কেমন যেন লাগছিল, বেচারীর মনের মধ্যে ঢুকছিল না।

ইতিমধ্যে কখন গুটি গুটি পায়ে মামনি এসে পিছনের দিকে বসে ওদের দলে যোগ দিয়েছে তা কেউই খেয়াল করেনি। হঠাৎ মাতুই নিঃস্তব্ধতা ভেঙে বেশ গম্ভীর মুখেই বলল—এবার সব বুঝেছি!

— কি বুঝেছিস্ তুই? জিজ্ঞেস করল বাপ্পু

—কি জানিস্ দাদা ভাই, ওই যে মাঝে মাঝে বাবার সাথে মামনির ঝগড়া মত হয় না, ওটা আসলে ঐ পাজিরস, ফোরোমমেরই কারসাজি।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই॥

সুধাংশু পাত্রের

বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ১০্ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

শ্বসন : কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

তপন কুমার ধাড়া

1. শ্বসন কাকে বলে ?

উঃ যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোষস্থ খাদ্য জারিত হয়ে খাদ্যস্থ স্থৈতিক শক্তি গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত ও মুক্ত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় তাকে শ্বসন বলে।

2. শ্বসন কখন এবং কোথায় হয় ?

উঃ প্রতিটি সজীব কোষে শ্বসন দিনরাত ঘটে। শ্বসনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়া কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে এবং দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ক্রেবস চক্র কোষের কোষঅঙ্গানু মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে।

3. কোষের শক্তি ঘর কাকে এবং কেন বলে ?

উঃ মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলে।

শ্বসনের অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি মাইটোকনড্রিয়াতে ঘটায় মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলে।

4. গ্লাইকোলাইসিস কি ?

উঃ যে প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ বিভিন্ন উৎসেচকের সহায়তায় আংশিক জারিত হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে।

5. দহন কাকে বলে ?

উঃ যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোনবস্তু উৎসেচক ছাড়া কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে এবং শক্তির মুক্তি ঘটায়, তাকে দহন বলে।

6. দহন ও শ্বসনের পার্থক্য লেখ ?

উঃ (i) দহন একটি অজৈব রাসায়নিক ভৌত প্রক্রিয়া। শ্বসন একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

(ii) দহন অনিয়ন্ত্রিত এবং এই প্রক্রিয়ায় উৎসেচকের কোন ভুমিকা নেই।

শ্বসন নিয়ন্ত্রিত এবং এই প্রক্রিয়ার উৎসেচকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(iii) দহন প্রক্রিয়ায় শক্তির দ্রুত মুক্তি ঘটে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তির মুক্তি ঘটে ধীরে ধীরে।

(iv) দহন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

শ্বসন প্রক্রিয়াটি অক্সিজেন ছাড়াও ঘটতে পারে।

(v) দহন প্রক্রিয়ায় তাপ ও আলো উভয়েই উৎপন্ন হয়।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় আলো উৎপন্ন হয় না এবং তাপের পরিমান দহনের তুলনায় অনেক কম।

(vi) দহন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি সঞ্চিত হয় না পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি ATP অণুর মধ্যে সঞ্চিত হয়।

7. শ্বসন কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ শ্বসন দুই প্রকার।

(i) সবাত শ্বসন ও (ii) অবাত শ্বসন,

8. সবাত শ্বসন কাকে বলে ? রাসায়নিক সমীকরণটি লিখ ?

উঃ যে পদ্ধতিতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষ মধ্যস্থ খাদ্য সম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং 674 keal তাপ শক্তি উৎপন্ন করে তাকে সবাত শ্বসন বলে। রাসায়নিক সমীকরনটি হইল—

$$\underset{(\text{গ্লুকোজ})}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 \xrightarrow{\text{উৎসেচক}} 6CO_2 + 6H_2O + 674 \text{ keal শক্তি}$$

9. অবাত শ্বসন কাকে বলে ? ইহার রাসায়নিক সমীকরণটি লিখ ?

উঃ যে প্রক্রিয়ায় কোষ মধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভাবে জারিত হয়ে অল্প পরিমাণ অর্থাৎ 25-28 Keal তাপশক্তি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ইথাইল অ্যালকোহল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাকে অবাত শ্বসন বলে। রাসায়নিক সমীকরণটি হইল—

$$\underset{(\text{গ্লুকোজ})}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow{\text{উৎসেচক}} \underset{(\text{ইথাইল অ্যালকোহল})}{2C_2H_5OH} + 2EO_2 + 25\text{—}28 \text{ Keal শক্তি}$$

10. অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসনের মূল প্রভেদ কি ?

উঃ অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসনের মূল প্রভেদটি হল :

অবাত শ্বসন একটি অন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়া এবং সবাত শ্বসন হইল একটি বহিঃকোষীয় প্রক্রিয়া।

11. অবাত শ্বসন ও সবাত শ্বসনের পার্থক্যগুলি লিখ।

উঃ (i) অবাত শ্বসন অক্সিজেনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ঘটে।

সবাত শ্বসন অক্সিজেনের অনুপস্থিতি এবং উপস্থিতিতে ঘটে।

(ii) অবাত শ্বসনে গ্লুকোজের অসম্পূর্ণ জারণ হয়। সবাত শ্বসনে গ্লুকোজের সম্পূর্ণ জারণ হয়।

(iii) অবাত শ্বসনে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ অনেক কম, 25-29 Keal। সবাত শ্বসনে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ অনেক বেশী 674 Keal.

(iv) অবাত শ্বসনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। সবাত শ্বসনে কাবন-ডাই-অক্সাইড এবং জল উৎপন্ন হয়।

(v) অবাত শ্বসন কেবলমাত্র কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে।

সবাত শ্বসন কোষের সাইটোপ্লাজম এবং মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে।

12. সন্ধান কাকে বলে?

উঃ যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কয়েক রকম ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দেহ নিঃসৃত উৎসেচকের প্রভাবে দেহ কোষের বাইরে শর্করা জাতীয় দ্রবণ (গ্লুকোজ) জারিত হয়ে ইথাইল অ্যালকোহল বা ল্যাকটিক অ্যাসিড (বা অপর কোন জৈব অ্যাসিড) উৎপন্ন করার ফলে দ্রবণটি গেঁজে ওঠে, তখন তাকে সন্ধান বলে।

13. সন্ধান কোথায় এবং কোন কোন জীবনের দ্বারা ঘটে?

উঃ সাধারণত সরল শর্করার (গ্লুকোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি) দ্রবণে সন্ধান প্রক্রিয়াটি ঘটে।

সন্ধান—ইস্ট, ল্যাকটোব্যাসিলাস প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর জীবের দ্বারা ঘটে।

14. সন্ধান ও অবাত শ্বসনের পার্থক্যগুলি লেখ?

উঃ (i) সন্ধান বহিঃকোষীয় প্রক্রিয়া। অবাত শ্বসন অন্তঃকোষীয় প্রক্রিয়া।

(ii) সন্ধান প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোলাইসিসের পর আর শক্তি উৎপন্ন হয় না। অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোলাইসিসের পরও শক্তি উৎপন্ন হয়।

(iii) সন্ধান প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি অবাত শ্বসনের তুলনায় কম।

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি সন্ধানের তুলনায় বেশি।

(iv) সন্ধান প্রক্রিয়া নিম্নশ্রেণীর আনুবীক্ষনিক জীবের দ্বারা ঘটে।

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া উন্নত শ্রেণীর জীবদেহে পরিলক্ষিত হয় যেমন—প্রাণীদেহের পেশী ও উদ্ভিদের বীজে।

(v) সন্ধান প্রক্রিয়া অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ঘটে। অবাত শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে ঘটে।

(vi) সন্ধান প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ উপাদান রূপে ইথাইল অ্যালকোহল, ল্যাকটিক অ্যাসিড বা অন্যান্য অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ উপাদান রূপে সব সময় ইথাইল অ্যালকোহল ও ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়;

15. শ্বসনের কার্যগুলি লিখ।

(i) শ্বাস বায়ুর আদান-প্রদান : এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ হয় এবং দেহ কোষ হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দূরীভূত হয়।

(ii) রেচন : এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় উদ্বায়ী পদার্থ যেমন—অ্যামনিয়া, ফিবটেন বডি, তেল, অ্যালকোহল, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি নির্গত হয়।

(iii) শোষণ : এই প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ এবং উদ্বায়ী পদার্থ যেমন—CO, NO অ্যামনিয়া নাইট্রেট ইত্যাদি প্রাণিদেহে শোষিত হয়।

(iv) অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য : দেহ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগের মাধ্যমে দেহের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকে।

(v) জলের ভারসাম্য : শ্বসন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে জলীয়বাষ্প নির্গত হয়ে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।

(vi) তাপের ভারসাম্য : নিঃশ্বাস বায়ুর সঙ্গে বেশ কিছু তাপ দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়। ফলে দেহে তাপের ভারসাম্য বজায় থাকে।

(vii) বায়ুর চাপের ভারসাম্য : জীবদেহে শ্বসন প্রক্রিয়া হয় বলে বাইরের বায়ুর চাপের ভারসাম্যতা বজায় থাকে।

ত্রিবেনী টিস্যু, চন্দ্রহাটী, হুগলী।

উন্নত প্রজাতি সৃষ্টিতে কলমের ব্যবহার

জনি সরকার

পৃথিবীতে কবে থেকে যে কলমের মাধ্যমে অতি দ্রুত ও উন্নততর ফলমূল উদ্ভিদ থেকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে তা সঠিক অনুমান করা যায় না। তবে এই কলম পদ্ধতি যে ফলমূল সৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এক মস্তবড় অবদান, তা অস্বীকার করা যায় না। গোলাপ, জবা, লেবু, লিচু, আম, কুল, পেয়ারা, জাম, ফুলের মধ্যে স্থল পদ্ম, গন্ধরাজ ফুলের গাছে কলম করে তা থেকে অতি দ্রুত ফুল ও ফল পাওয়া যায়। এই ফল ও ফুলও কিন্তু উন্নত গুণমানে হয়। কলমগুলি সাধারণত নানা রকমের হয়। শাখাকলম, দাবাকলম, গুটিকলম, জোড়াকলম।

লেবু গাছে কলম করা হবে। ঠিক আছে। লেবু গাছের সতেজ ডালটির ছালটি ধারালো ব্লেড দিয়ে গোল করে কাটতে হবে। কেটে ছালটি আলতো ভাবে উঠিয়ে ফেলতে হবে। এবার ওখানটা সার মাটি দিয়ে (কম্পোস্ট সার) বন্ধ করতে হবে। পচা বস্তা জাতীয় বা কোনো প্লাস্টিক দিয়ে ঐ স্থান সযত্নে বাঁধতে হবে যাতে অতি বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে না পড়ে। বৃষ্টির জলে, বা জল দিলে কিছু দিন পরে দেখবে মাটি ভেদ করে চারিদিকে সাদা ফল। অথচ তুমি লেবুর বীজ পুঁতলে কয়েক বছর লেগে যেতো ফল পেতে। কি দ্রুত, কলমের সাহায্য অবলম্বন করে ফল পাওয়া গেল। এতো গেল তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া। এবার যদি আরও উন্নত ধরণের ফল পাবার আশা করি তবে এই পদ্ধতি বিরাট সাহায্যের হাত বাড়াবে। কিম্বা তুমি যদি ঐ একই প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে চাও অর্থাৎ এক গাছে দু প্রকারের ফল ফলাতে চাও এই পদ্ধতি নিতে হবে (ফল একই কিন্তু ফলের, আকার গঠনগত দিক ভিন্ন হবে)। মনে করি আমার কুলগাছটিতে শুধু গোল কুল হয়ে থাকে। আমি এক গাছেই দুই কুল, নারকেল কুল আর যে কুল আছে অর্থাৎ গোল কুল চাই, এই পদ্ধতি গ্রহণ কর, সব হয়ে যাবে। আমার বাড়ির গোল কুলের ডালের মধ্যে গোল করে ছাল কেটে ফেলে দেব। এবার যে গাছে নারকেল কুল আছে সেই গাছের ডাল থেকে গোলকুল-এর কাটা ছালের আকারের (সমান সাইজের) ছাল কেটে গোল কুলের কাটা অংশে লাগিয়ে মাটি দিয়ে ভালভাবে জুড়ে দেব। বৃষ্টি বা জল লাগতে দাও। দেখবে কয়েক বছর পর বা পরের বছর (আমার এখানে এক বছর পর

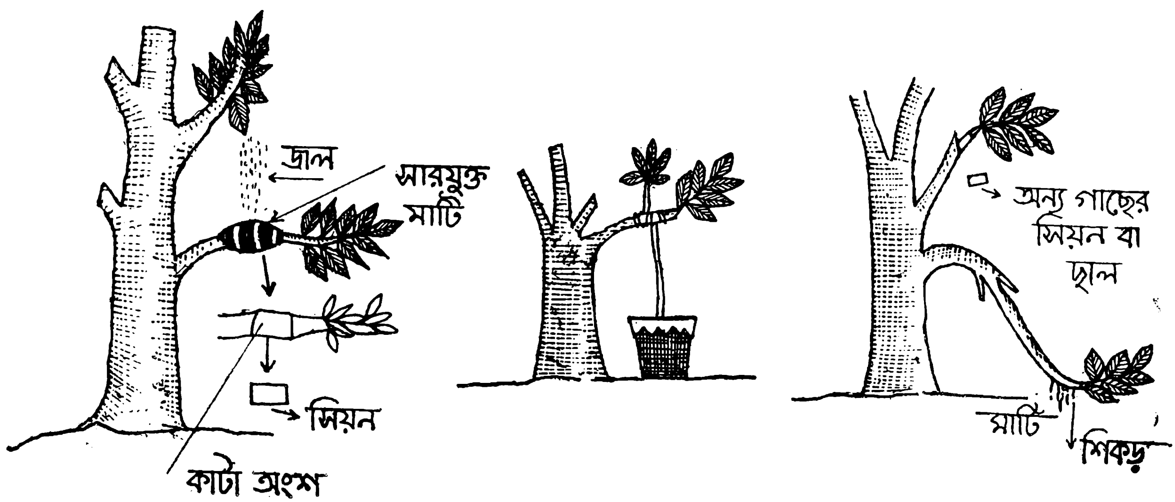

শেকড়ে ছাড়িয়ে গেছে। এবার ডালটিকে আগের অংশ থেকে কেটে বাড়িতে বাগানে বসিয়ে দাও। দেখবে কয়েক বছর বা পরের বছরে গাছে ফুল এসেছে, ধরেছে সুগন্ধি লেবু হয়েছে) তোমার এক গাছেই, দুই কুল (নারকেলী, গোলকুল) ফলেছে। সুন্দর নয় কি ?

নিবাধুই উচ্চ বিদ্যালয়, দত্ত পুকুর, 24-পরগণা-উঃ।

ঘুম রহস্য

কেশবচন্দ্র প্রধান

ঘুম মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভালো ঘুম না হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্যই মানুষের পরম সম্পদ। স্বাস্থ্যকে অব্যাহত রাখতে হলে যে টুকু ঘুম মানুষের প্রয়োজন সেটা না হলে চলবে না, বিজ্ঞানীদের মতে একজন পুরুষ মানুষের 24 ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে 6-7 ঘণ্টা এবং একজন স্ত্রীলোকের 24 ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে 7-8 ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। অতি ঘুম যেমন ভালো নয়, অনিদ্রাও তেমন অস্বাভাবিকতার লক্ষণ। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ঘুমের পরিমাণ বেশি, সারাদিনে তারা 10-12 ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায়। অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ঘুমের পরিমাণ বেশি হয়। দুর্বল লোকেরা 8-9 ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমায়। সারাদিন কর্ম-জীবনের ক্লান্তির পর মানুষরা রাতে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং সকালে ঝরঝরে তাজা প্রাণ নিয়ে জেগে ওঠে।

ঘুমের সঙ্গে মানুষের যেন চিরদিনের চিরকালের অন্তরের গভীরতম সূত্রের নিগূঢ় বন্ধন। ঘুম পরিশ্রান্ত দুর্বল মানুষের কাছে অমৃত সমান। এই ঘুম সম্পর্কে কত গান, কবিতা কত প্রবচন রয়েছে। মায়েরা ছোট শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বলেন "আয় আয় চাঁদ মামা ঘুম দিয়ে যা" ইত্যাদি। শুধু মানুষ নয় অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও ঘুমের বৈচিত্র্য আছে।

মানুষের মধ্যে ঘুমের রেকর্ড করেছিলেন রামায়ণের কুম্ভকর্ণ, তিনি একটানা ছয় মাস ঘুমোতেন এবং ছয়মাস জেগে থাকতেন। সবচেয়ে কম ঘুমের রেকর্ড করেছিলেন লক্ষণ। তিনি চোদ্দ বছর অনিদ্রায় কাটিয়ে ছিলেন। বর্তমানে বিদেশের এক মহিলা একটানা সাতদিন ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে বিশ্বে এক নতুন রেকর্ড করলেন।

এবার আসা যাক অন্যান্য প্রাণীদের কথায়, মাছেদের চোখের পাতা নেই; তবু তারা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোয়, হাঙ্গর, লাং ফিস প্রভৃতিকে দিনের বেলায় সমুদ্র চরে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। রাত্রে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যাঙেরা সারাদিন গর্তে ঢুকে থাকে, রাত্রে শিকারের আশায় বের হয়। ব্যাঙ শীতকালে গর্তের মধ্যে শীতঘুম করে, এ সময় এরা কিছুই খায় না এবং গর্তের বাইরে আসে না, সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীরা দিনের আলোতে সাধারণতঃ লুকিয়ে থাকে। রাত্রে শীতল আব-হাওয়ায় বের হয় খাদ্যান্বেষণে। পাখিদের ঘুম খুব পাতলা হয়। হাঁস জাতীয় পাখিরা জলের উপর ভেসে থাকা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। সারস পাখিরা জলে একটু পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, মুখটা পালকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিব্যি আরামে ঘুম দেয়। অন্যান্য ছোট পাখিরা গাছের ডালে বাসা বেঁধে নতুবা কোটরের মধ্যে বিশ্রাম নেয়। অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাংমুখো পাখিদের আবার অদ্ভুত ধরনের ঘুম। ঘুমন্ত অবস্থায় এদের পাশের পাখিকে গুলিবিদ্ধ করলেও পাশের পাখিটির ঘুম ভাঙে না। গাং চিলেরা অল্প সময়ের জন্য ঘুমায়।

সন্ধিপদী প্রাণীদের মধ্যে প্রজাপতিরা ডানা দুটি জুড়ে অচেতন হয়ে ঘুম দেয়। ঘুমন্তাবস্থায় এদের এক থেকে অন্যস্থানে নিয়ে গেলেও টের পায় না। মথরা দিনের বেলা ঘুমায় এবং রাত্রে ঘুরে বেড়ায়। বোলতারা চিৎ হয়ে ডানা মেলে ঘুমায়। পিঁপড়েরা সারাদিন সারারাত খাদ্য সংগ্রহ কিংবা বাসা তৈরিতে ব্যস্ত থাকে; তার মধ্যে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমই তাদের যথেষ্ট। ক্ষতিকারক পতঙ্গদের নিম্ফ অবস্থায় ঘুম সম্পন্ন হয়। শামুক জাতীয় প্রাণীরা এক থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত মাটির নিচে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে পারে। এ সময় এদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এক ধরনের পতঙ্গ দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত মাটির নিচে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তারা ঘুমিয়ে কাটায়। এই পতঙ্গের নাম 'সিডাকারা।'

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও ঘুমের রহস্য লক্ষ্য করা যায়, বাদুড়রা গাছের ডালে ঝুলন্তাবস্থায় ঘুমিয়ে থাকে। অল্প জায়গায় একটি বাদুড়ের গায়ে অপর একটি বাদুড়কে ঝুলে ঘুমাতে দেখা যায়। চামচিকেরা গাছের কোটরে কিংবা ফাঁপা বাঁশের মধ্যে একত্রে ঘুমিয়ে থাকে। গরু, ছাগল চার পা গুটিয়ে বিশ্রাম করে। ঘোড়া দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে নেয়। হাতীরা সাধারণতঃ দিনের বেলায় ঘুমায় না, রাত্রে 2-3 ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়। কুকুর দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমায় আর রাত্রে ঘরে পাহারা দেয়। কুকুরকে ছয়-সাত দিন ঘুমোতে না দিলে কুকুর নির্ঘাত মারা যাবে। বিড়াল খুব আরামে ঘুমাতে ভালোবাসে। বিছানা বা উনুনের পাশে গরমে পেটের মাঝখানে মুখ ঢুকিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এই অবস্থায় বিড়ালের গলা থেকে এক প্রকার ঘুড়্ ঘুড়্ শব্দ পাওয়া যায়। খরগোস কোন ঝোপ বা উঁচু বাঁধের পাশে মুখ গুঁজে ঘুমায়, মনে করে তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ সে তো চোখ বুঁজে আছে এবং কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তিমি মাছ ঘুমাবার সময় হলে

জলের উপর উঠে আসে এবং ভেসে থেকে ঘুমায়। ভোঁদড় জলের উপর চিৎ হয়ে ঘুমায়। জলহস্তীদের একজনের পিঠে আর একজনের মাথা রেখে ঘুমাতে দেখা যায়। কচ্ছপরা সমস্ত শীতকালটা গর্তের মধ্যে ঘুমাচ্ছন্ন থাকে এবং গ্রীষ্মে গর্ত থেকে বেরোয়। শ্লথ সুউচ্চ বৃক্ষের ডালে চার পায়ের নখ বিদ্ধ করে ঝুলেই নিশ্চিন্তে ঘুমায় আমেরিকায় কোয়ালারা ইউক্যালিপটাস গাছে বাসা বাঁধে এবং সেই গাছেই বিশ্রাম নেয়, শিম্পাঞ্জীরা প্রত্যেকদিন নতুন নতুন বাসা তৈরি করে যেমন আমরা প্রত্যেকদিন বিছানা পাতাই। ওরাং ওটাং উঁচু গাছের ডালে ঝুলন্তাবস্থায় ঘুমায়। কুমির বিশ্রামের সময় হলে জল থেকে ডাঙায় রোদ লাগা জায়গায়মাটির সঙ্গে পেট লেপ্টে শুয়ে থাকে এবং চোখ বুঁজে ঘুমায়, কিন্তু সর্বদা সজাগ থাকে।

কেবলমাত্র প্রাণীরাই ঘুমায় না, উদ্ভিদরাও ঘুমায়, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিভিন্ন উদ্ভিদের ঘুমের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। রাত্রিবেলা উদ্ভিদরা বিশ্রাম নেয়।

মানুষ উন্নত শ্রেণীর প্রাণী, তাই তারা ঘুমকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। দিনের বেলা ঘুমানো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। দিবানিদ্রা অনেক রোগকে আমন্ত্রণ জানায়। মানুষের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে অনেক কিছু দেখতে হবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে। মানুষ যদি অধিকক্ষণ ঘুমায় তাহলে জীবনে তাদের অনেক কিছু হারাতে হবে, ভ্রূণ সৃষ্টির পর থেকে জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত মানুষ ঘুমিয়ে কাটায়। জীবনযাত্রা শেষ করে মানুষকে পুনরায় চিরনিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়তে হয়। পাশ্চাত্যের বহু মানুষকে আবার ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে শোনা যায়। জীবনকে পূর্ণ উপভোগ করতে হলে আমাদের ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। তাহলে ব্যর্থ জীবন নিয়ে চলে যেতে হবে।

ধূমকেতু ঃ তত্ত্বে ও তথ্যে

শচীনন্দন আঢ্য

1986তে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হচ্ছে বলে বিজ্ঞানী মহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেল। কোথায় কোথায় দেখা যাবে, কতটা লেজ বিশিষ্ট হবে এবং লেজ খসে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও গবেষণার অন্ত ছিল না। অবশ্য তার আবির্ভাব এখনো হল না। যদিও 1989তে আমরা পদার্পণ করলাম।

ধূমকেতু তত্ত্ব জানতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব তোড় জোড় নিয়েছিল। ধূমকেতুটির ওপর পর্যবেক্ষণ চালাতে বড় রকমের একটি মহাকাশ যান পাঠাবার ব্যবস্থা হয় এবং তার ব্যবস্থা করেনন মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাশা বা National Astronomics and Space Adminstration যানটির গতি ছিল সেকেণ্ডে 57 কিলোমিটার। ঠিক ছিল ধূমকেতুটি সূর্যের নিকটতম অঞ্চলে আসার 15 দিন আগে প্রথমে উৎক্ষিপ্ত হবে আর একটি ছোট মহাকাশ-যান, ধূমকেতুটির উপর পর্যবেক্ষণ চালাবার জন্য।

ধূমকেতুর তাপমাত্রা তার চার পাশের গ্যাস, রাসায়নিক বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় এবং তাপমাত্রা ঘনত্বের পরিমাপ, অভ্যন্তরভাগে যে ধূলিকণা থাকে তার গঠন ও আকৃতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য, সেখানকার চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ ও মাত্রা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। ধূমকেতু দেখা গেছে এতাবৎ 29 বার। 280 খ্রীস্টপূর্বাব্দে ধূমকেতু তথ্য নাকি প্রথম নথীভুক্ত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ 1910 খ্রীস্টাব্দে ধূমকেতুর প্রথম সঞ্চার পথ আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ মহাকাশ বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি।

প্রতি 5·3 বছর অন্তর একটি করে শর্ট পিরিয়ড কমেট বা ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এ যাবৎ ধূমকেতুর সংখ্যা দাঁড়াবে এক হাজার কোটির মত।

ধূমকেতুর গ্রীক নাম "কামেটেন" অর্থাৎ চুলবিশিষ্ট নক্ষত্র। এর মাথাকে বলা হয় "কোমা"। ধূমকেতুর অভ্যন্তরে যেসব কণা থাকে তাকে বলে মূলক বা Redical।

এক একটি ধূমকেতু সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে পরিক্রমণ করার সময় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দশ টনের মত ধূলিকণা মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়।

ধূমকেতুর আর এক তত্ত্বের নাম "গ্র্যাভেল ব্যাঙ্ক থিয়োরী"। 1950 খ্রীস্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক Fred El Huipal এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা।

তিনি বলেন ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস মুখ্যতঃ বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি। আর পাথরগুলিতে থাকে শোষিত গ্যাস। সূর্যের নিকটবর্তী হলে ঐ গ্যাস পরিত্যক্ত হয়।

1910 এর ধূমকেতুতে নাকি একটি বরফ পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, যার ব্যাস ছিল 7 কিলোমিটারেরও কিছু বেশি।

151, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া-2

লাল রঙ জলের নিচে কখনও সবুজ, কখনও কালো

দেবাশিস্ বসু

তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি, 'রক্তের রঙ কি?' তুমি তক্ষুনি বলে উঠবে—লাল। উত্তরটা ঠিকই হলো। কিন্তু কেন এই লাল রঙ? এর কারণ মানুষের শরীরে যে রক্ত থাকে তাতে আছে লাল হিমোগ্লোবিন কণা। আর এই হিমোগ্লোবিনে থাকে লোহা। আবার সমুদ্রে থাকে এমন অনেক পোকামাকড় যাদের শরীরে আছে ক্লোরেংকুওরিণ এবং তাতে থাকে লোহার অক্সাইড। তবে তাদের রক্ত সবুজ।

কোনো লাল বস্তুকে দিনের আলোয় লাল দেখায়, কারণ বস্তুটি দিনের আলোর কয়েকটি রশ্মি শোষণ করে এবং লাল রশ্মি প্রতিফলিত করে। দিনের আলোর রঙ সাদা। যদি লাল ফুলের ওপর নীল আলো ফেলা যায়, তবে লাল ফুল আর লাল দেখাবে না, সেটি তখন কালোই দেখাবে। এর কারণ হলো লাল ফুল বাইরে থেকে আসা নীল রং শোষণ করে নেয় এবং তা কোনো রশ্মিই প্রতিফলিত করে না। আর তাই লাল, নীলের দাপটে কালো বনে যায়।

লাল রঙ জলের গভীরে কি রঙে পরিণত হয় তা নিয়ে একবার একটা পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষাটি করতে এক ডুবুরীকে 30 মিটার জলের নিচে পাঠানো হয় এবং সে জলের নিচে রঙের মজা দেখতে পায়। ডুবুরীকে পরীক্ষার জন্য একটা কাচের শিশিতে কিছু পরিমাণ রক্ত আর লাল রঙের কলম দিয়ে জলের নিচে পাঠানো হয়। সে যখন 30 মিটার নিচে চলে এল তখন দেখল লাল কলমটা কালো দেখাচ্ছে। কলম নিয়ে পরীক্ষা শেষ অর্থাৎ লাল কলম কালো হয়ে গেছে। আর একটা পরীক্ষা বাকী আছে। সে যে রক্ত শিশিতে এনেছিল তা জলে ঢেলে দিল আর দেখল, লাল রক্ত আর লাল নেই, সবুজ হয়ে গেছে। এবার ফেরার পালা। হঠাৎ ডুবুরী দেখতে পেলো কয়েকটা ছোট ছোট কালো রঙের মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চট করে সে একটা মাছ কায়দা করে ধরে ফেললো। একটা মাছ পেয়েই সে খুশী হয়ে গেল।

মাছটা নিয়ে আর পরীক্ষা দুটো শেষ করে ডুবুরী আবার জলের ওপরে ফিরে এল। এসে কি দেখল জানো?—দেখলো, তার কালো কলম আবার লাল হয়ে গেছে। শুধু কি তাই, এছাড়া সে যে কালো মাছটা ধরেছিল সেটি আসলে একটা লাল মাছ। এরকমটা কেন হল তাই বলি। আমরা জানি, মানুষের রক্তের রঙ লাল এবং তাতে আছে হিমোগ্লোবিন অণু। এর অণুগুলি লাল এবং সবুজ দুটো রশ্মিই প্রতিফলিত করতে পারে। জলের বাইরে হিমোগ্লোবিনের দিনের আলোর লালরশ্মি প্রতিফলন করার ক্ষমতা সবুজ রশ্মির চেয়ে অনেক বেশী, তাই জলের বাইরে দিনের আলোর রক্ত লাল দেখায়। কিন্তু গভীর জলে (30 মিটারের বেশী নিচে) হিমোগ্লোবিন লালের চেয়ে সবুজ রশ্মিকে বেশী প্রাধান্য দেয়, তাই রক্ত সবুজ দেখায়। কিন্তু লাল কলম বা লাল মাছ এই গভীরতায় সবুজ ও নীল পরিধির সব রশ্মি-শোষণ করে এবং তাই এদের কালো দেখায়।

এবার যদি ডুবুরী আরো অনেক গভীর জলে গিয়ে ঐ একই রকম পরীক্ষা করতো তবে সে কি দেখতো, জানো?—সে দেখতো রক্ত ও লাল কলম দুটোই কালো দেখাচ্ছে। তবে গভীরতাটা তখন আগের প্রায় 7 গুণ হতে হবে। জলের বাইরে আর জলের বিভিন্ন গভীরতায় লাল রঙ কখনও সবুজ বা কখনও কালো বনে যাচ্ছে। সুতরাং জলের গভীরে কোনো বস্তুর রঙকে আসল রঙ ভাবা কখনই ঠিক নয়।

গ্রাম বুইয়া, পাতুলিয়া, 24-পরগণা।

আলেকজান্ডার বেলায়েভের কাহিনী অবলম্বনে

উভচর মানব

বাণীরূপ : অনিল কর্মকার/চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

তীরবেগে এগিয়ে এসে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো হাঙরের পিঠে…
ভয়ার্ত ডুবুরী ততক্ষণে জেলিফিসের ডেক লক্ষ্য করে সাঁতার কেটে চলেছে…
বাঁ-চা-ন ! হা-ঙ-র! দরিয়ার দানো !
দানো ! কেমন দেখতে? মানুষের মতো ?
হ্যাঁ,তাই। মাছের মতো সাঁতার কেটে এসে পড়লো আমার সামনে…
উঃ , দানো না থাকলে এতোক্ষণ হাঙরের পেটে।
চুপ! দানো বোল না, বলো সাগরদেব। উনি তোমাকে বাঁচিয়েছেন।
ঘটনাটা বারবার চিন্তা করতে থাকে ক্যাপ্টেন…
আশ্চর্য কান্ড ! এটা তো ঠিক, হাঙরটাকে কেউ সত্যিসত্যিই মেরেছে।
অথচ তাকে আমরা কেউ দেখিনি। তার মানে… মাছের মতোই সে বেঁচে থাকতে পারে জলের তলায়। ওহ, একবার যদি তাকে পাই…
…ভুঁউউউউ…ভুঁউউউ…
বড়লোক হয়ে যাবো… সারা আমেরিকায় আমাকে টেক্কা দেবার কেউ থাকবে না। একি! শাঁখের শব্দ…তবে কি…

ঐ-ঐ তো একজন যুবাপুরুষ-ডলফিনের পিঠে...
লিডিঙ-জলচি-সামনে...
পুঁউউউউ...
দেখো...দেখো বালথাজার... এ কী আশ্চর্য কাণ্ড!
গৌতম কর্মকার
ঐ যাঃ, হারিয়ে গেল! সমুদ্রের তলায়। এও কি সম্ভব? জলের গভীরে একজন মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকতে পারে?
যা দেখলাম তা তো আর কোনও গল্প নয় বালথাজার, এই সমুদ্রেই ওর বসবাস।
একবার যদি ওকে পাই... তাহলে হাজার হাজার মুক্তো... জেলিফিসের ডেক একদম ভরে যাবে একটি পয়সাও ডুবুরীর জন্যে লাগবেনা।
কিন্তু ক্যাপ্টেন, কেমন করে ওকে ধরবেন?
চেষ্টা করো, ধরতেই হবে। সবকটা ডুবুরীকে আমি বিদেয় করে দেবো বালথাজার। থাকবে কেবল তুমি। যা চাইবে, তাই দেবো।
যেমন ভাবনা তেমনি কাজ।
জনাকয় মাত্র নাবিক নিয়ে ভেসে চললো জেলিফিস...
7

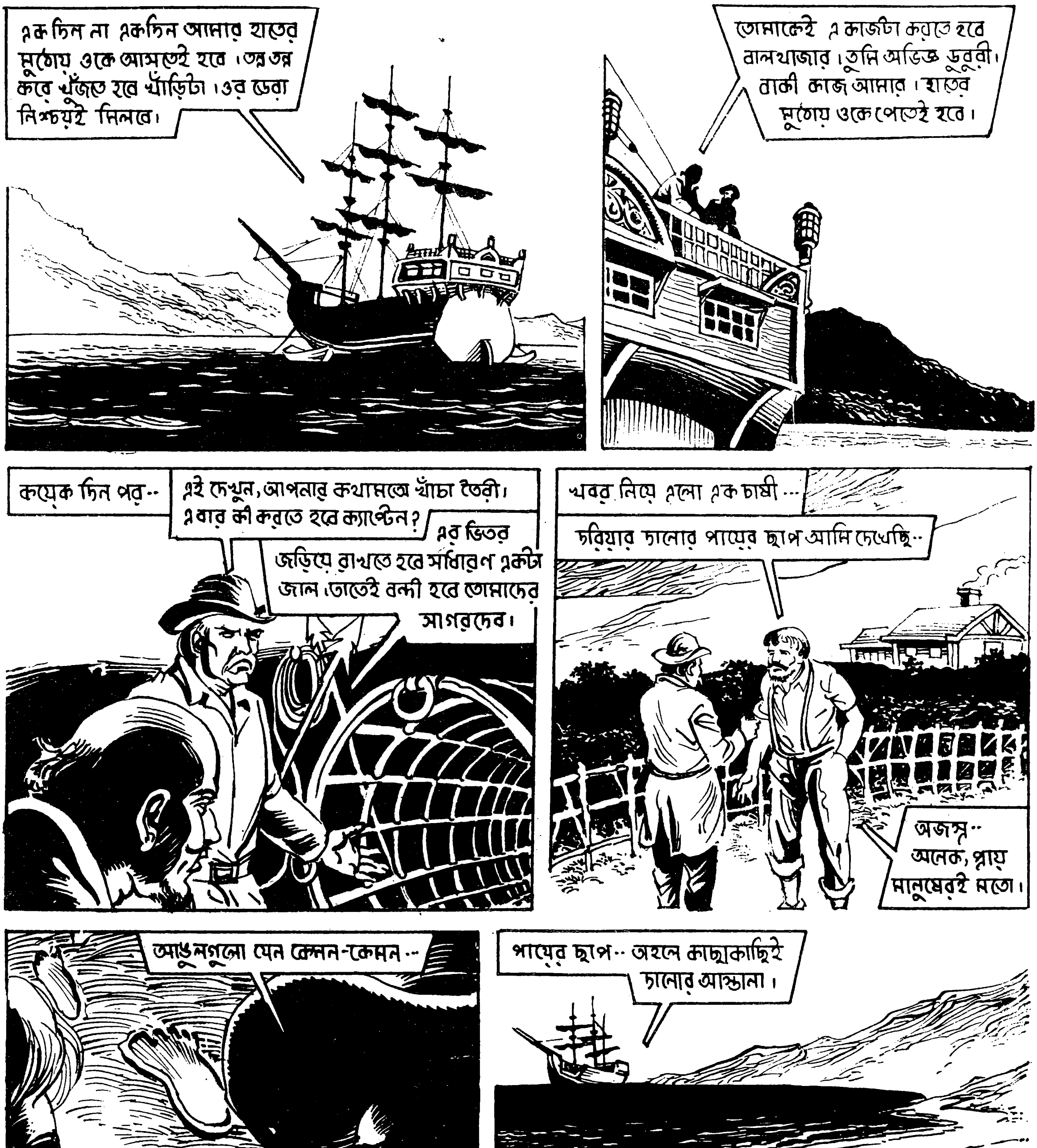
এক দিন না একদিন আমার হাতের মুঠোয় ওকে আসতেই হবে। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হবে খাঁড়িটা। ওর ডেরা নিশ্চয়ই মিলবে।
তোমাকেই এ কাজটা করতে হবে বালথাজার। তুমি অভিজ্ঞ ডুবুরী। বাকী কাজ আমার। হাতের মুঠোয় ওকে পেতেই হবে।
কয়েক দিন পর··
এই দেখুন, আপনার কথামতো খাঁচা তৈরী। এবার কী করতে হবে ক্যাপ্টেন?
এর ভিতর জড়িয়ে রাখতে হবে সাধারণ একটা জাল। তাতেই বন্দী হবে তোমাদের সাগরদেব।
খবর নিয়ে এলো এক চাষী ···
দরিয়ার দানোর পায়ের ছাপ আমি দেখেছি··
অজস্র·· অনেক, প্রায় মানুষেরই মতো।
আঙুলগুলো যেন কেমন-কেমন···
হ্যাঁ, তা ঠিক।
পায়ের ছাপ·· তাহলে কাছাকাছিই দানোর আস্তানা।
খাঁড়ির তলাটা খুঁজে দেখতে হবে বালথাজার। আজই!

ফ্যাক্স বিপ্লব

সিদ্ধার্থ রায়

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে এক একটি আবিষ্কার বা উদ্ভাবন মানুষের চিন্তা এবং জীবনযাত্রাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে—এগুলিকেই আমরা সাধারণভাবে বিপ্লবাত্মক বলি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডালটনের পরমাণুবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর বা আধুনিক যুগের কম্পুটার প্রভৃতি বৈপ্লবিক আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনার উদাহরণ। যোগাযোগ বিজ্ঞানের (Communications) ক্ষেত্রে ফ্যাক্‌সিমিলি (facsimile) বা সংক্ষেপে ফ্যাক্স (fax) যন্ত্রটিও বিপ্লব ঘটাতে চলেছে।

ফ্যাক্স যন্ত্রটির বিবরণ দেবার আগে সংক্ষেপে যোগাযোগ বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। একাধিক মানুষের মধ্যে ভাব বা তথ্য (informatoin) বিনিময় করাকে বলা হয় যোগাযোগ। যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হল কথ্য বা লিখিত ভাষা। মানুষ ভাষা আবিষ্কার করার আগেও নিশ্চয়ই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করত, হয়ত বিভিন্ন মৌখিক শব্দ বা অঙ্গ-ভঙ্গির সাহায্যে। ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাবে বার্তা বিনিময় করাকে বলে সাংকেতিক যোগাযোগ। অঙ্গ-ভঙ্গির সাহায্যে, সমুদ্রের বুকে নাবিকরা আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে অথবা টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার সাহায্যে যে সংবাদ বিনিময় করা হয় তাদেরকে সাংকেতিক যোগাযোগ বলে। প্রকৃতপক্ষে ভাষাও সাংকেতিক মাধ্যম। বাংলা ভাষায় "জল" বা "ঘুম" শব্দদুটির মাধ্যমে একধরণের তরল পদার্থ বা প্রাণিদের একটি শারীরিক অবস্থা বোঝায়; আবার ইংরাজী ভাষায় একই অর্থ বোঝায় অন্য দুটি সংকেত "Water" এবং "Sleep".

দূর দূরান্তরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতে পারার ক্ষমতা বিংশ শতাব্দীর জীবন যাত্রাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। টেলিফোন, রেডিয়ো এবং টেলিভিশন আজ শহরবাসীর জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এগুলি আজ সরাসরি মৌখিক বা লিখিত ভাষার প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র ব্যবহারিক জীবনেই নয়, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য বিষয়। তথ্য বিনিময় করার দ্রুত এবং নির্ভুল ব্যবস্থা ছাড়া আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেমন কম্পুটার চালিত মেশিন বা রোবট থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযান, কোনটাই সম্ভব নর। এসব ক্ষেত্রে যে সব তথ্য বিনিময় করা হয় সেগুলি ভাষাবাচক নয়। উদাহরণ স্বরূপ মহাকাশযাত্রার ক্ষেত্রে রকেট থেকে পৃথিবীর বুকে নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে যে তথ্যগুলি আসে সেগুলি মহাকাশযানের গতিবেগ, অবস্থান, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, জ্বালানীর পরিমাণ ইত্যাদি হতে পারে, আর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের থেকে যায় মহাকাশযানের দিক পরিবর্তনকারী ইঞ্জিন চালু করার নির্দেশ, ক্যামেরা চালু করার সংকেত ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এ জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রথমে বিভিন্ন তথ্যগুলিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে পরিবর্তিত করা হয় এবং সেগুলিকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ এবং গ্রহণ করা হয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় লেসার রশ্মি এবং অপটিকাল ফাইবার নূতনতর দিগন্ত খুলে দিতে বসেছে, কিন্তু সে আলোচনা পরে অন্যত্র করা যাবে।

এবার ফিরে আসা যাক ফ্যাক্স যন্ত্রের কথায়। ফ্যাক্স কথাটি ফ্যাক্‌সিমিলি শব্দের জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত রূপ। Facsimile শব্দটির বাংলা অর্থ অবিকল প্রতিরূপ অথবা প্রতিকৃতি। ফ্যাক্‌সিমিলি যন্ত্রর সাহায্যে কাগজের উপর আঁকা হাতের লেখা, নক্‌শা অথবা ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি কোন একটি ছবিকে তার (wire) অথবা বেতার মারফৎ প্রেরণ করা এবং গ্রাহক কেন্দ্রে তার অবিকল প্রতিবিম্ব লাভ করা সম্ভব। ফ্যাক্‌সিমিলি যন্ত্রটি কিন্তু একেবারে নূতন এমন নয়। অনেকেই হয়তো খবরের কাগজে ছাপা কোন কোন ছবির তলায় "বেতার চিত্র (radio photograph)" কথাটি লক্ষ্য করেছ। কাগজ ছাপার অল্প সময় আগে সংঘটিত কোন জরুরী সংবাদ সম্পর্কিত কোন ফোটোগ্রাফ সাধারণত এই বেতার চিত্রগুলির বিষয়বস্তু হয়। আসল ফটোগ্রাফটি যখন ছাপাখানায় পাঠানোর সময় পাওয়া যায় না তখন বেতার ফ্যাক্‌সিমিলি যন্ত্রের সাহায্যে কোন ফটোগ্রাফকে দূর দেশ থেকে সরাসরি কাগজের দপ্তরের গ্রাহক যন্ত্রে পাঠানো হয় এবং তার থেকেই ছবিটি ছাপা হয়।

ফ্যাক্স যন্ত্রের সাহায্যে ছবি প্রেরণ এবং গ্রহণ করার প্রণালীর সঙ্গে টেলিভিশন সম্প্রসারণের মিল আছে। ছবিটিকে অসংখ্য বিন্দু অথবা ক্ষুদ্র আয়তক্ষেত্রে (areas) ভাগ করা হয়। এই আয়তনক্ষেত্রগুলির মাপ মোটামুটি

0·25mm × 0·25mm নেওয়া হয়। এক একটি আয়তক্ষেত্রর রঙ যতটা গাঢ় তার সমানুপাতিক বিস্তার (amqlitude) অথবা কম্পাংক (frepuency) বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরী করা হয়। যে সমস্ত আয়তক্ষেত্রগুলি মিলিয়ে পুরো ছবিটা তৈরী হয়েছে, সেই আয়তক্ষেত্রগুলির সমানুপাতিক বৈদ্যুতিক সংকেতগুলি পর পর বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় গ্রাহক কেন্দ্রে। এখানে সংকেতগুলির বিস্তার বা কম্পাঙ্কের আনুপাতিক আলোকিত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন আয়তক্ষেত্র তৈরী করা হয় কাগজ বা ফিল্মের উপর, ফলে প্রেরিত ছবির অবিকল প্রতিরূপ পাওয়া যায়। ফ্যাক্সের এই কার্যনীতি মোটামুটি ভাবে সহজ হলেও এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলি প্রেরিত বা গৃহীত হবার সময় বা বিকিরণের সময় যাতে বিকৃত না হয়ে যায় তার জন্য নানা ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এইজন্য বেতার চালিত ফ্যাক্সের দাম খুব বেশী, জনসাধারণের নাগালের বাইরে।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় সত্যিকারের বিপ্লব আনতে চলেছে টেলিফোনের মাধ্যমে ফ্যাক্সের প্রয়োগ পদ্ধতি। টেলি-ফ্যাক্স ("টেলিফোন-ফ্যাক্সিমিলি"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) বৈদ্যুতিক সংকেতকে সরাসরি টেলিফোনের তারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো চলে। যে দুটি যন্ত্রের মধ্যে ফ্যাক্স বার্তা বিনিময় করতে হবে, সে দুই প্রান্তে দুটি টেলিফোন থাকা দরকার। অল্পদামী (বর্তমানে 25—30 হাজার টাকায় বিদেশে পাওয়া যাচ্ছে) ফ্যাক্স যন্ত্রগুলি একই সঙ্গে প্রেরক এবং গ্রাহক। যন্ত্রগুলির সঙ্গে টেলিফোনকে সংযুক্ত করা যায়। এবার ডায়াল করে দুটি প্রান্তের টেলিফোনদুটিকে সংযুক্ত করলেই যন্ত্রদুটির মধ্যে ফ্যাক্স বার্তা বিনিময় করা যায়। গ্রাহক কেন্দ্রে বিশেষ কাগজের উপর সাধারণত এক রঙে বার্তাটি পরিস্ফুট হয়, যদিও একাধিক রঙে বার্তা বিনিময় করা সম্ভব। ফ্যাক্সে সাধারণত "থার্মাল পেপার" নামক কাগজ ব্যবহার করা হয়। এই কাগজের বিশেষত্ব হল, এতে লিখতে কোন কালি লাগে না, লেসার রশ্মি বা অন্য কোন উত্তপ্ত শলাকার স্পর্শে এতে দাগ পরে।

ফ্যাক্সের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার কি সুবিধা তা কয়েকটি উদাহরণ আলোচনা করলেই বোঝা যাবে ঃ

টেলিগ্রাফ এবং তার পরবর্তী উন্নততর যন্ত্র টেলেক্সের সাহায্যে তারের মাধ্যমে আমরা লিখিত বার্তা এক স্থান থেকে অন্যত্র পাঠাতে পারি কিন্তু কোন ছবি পাঠাতে পারি না। টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা শব্দ এবং কথা আদান প্রদান করতে পারি কিন্তু লিখিত সংবাদ অথবা চিত্র বিনিময় করতে পারি না। টেলিভিশনের মাধ্যমে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাণী এবং চিত্র গ্রাহকযন্ত্রে পাওয়া, কিন্তু যে কোন দুজনের মধ্যে তা সম্ভব নয়। পৃথিবীর যে কোন দুজনের মধ্যে লিখিত বার্তা বিনিময় সম্ভব হয়েছে টেলিফোন ফ্যাক্সিমিলির জন্য।

প্রযুক্তিবিদ্যায় ড্রয়িং-এর প্রয়োজনীয়তার কথা সকলেরই জানা—এটি প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার ভাষা। হাজার কথা লিখেও যা বোঝান সম্ভব নয়, একটি নক্শায় তা প্রকাশ করা সম্ভব। ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে মুহূর্তের মধ্যে নক্শা পাঠানো যায় যা আগে করতে হত ডাকযোগে। ফ্যাক্সের সাহায্যে আজকাল উপগ্রহ থেকে পাঠানো আবহাওয়ার পূর্বাভাষ সম্পর্কিত ছবি সরাসরি বহুকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সই করা নির্দেশ বা দলিল ইত্যাদিও এই যন্ত্রের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

দাম ক্রমে কমতে থাকায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিগত ভাবেও লোক ফ্যাক্স কিনছে। জাপানের একটি তথ্যানুসারে (পৃথিবীর বেশীর ভাগ ফ্যাক্স এখন জাপানে তৈরী হচ্ছে) 1988 সালে তিরিশ লক্ষর কাছাকাছি ফ্যাক্স বিক্রি হবার কথা!

ফ্যাক্স সহজলভ্য হওয়াতে এর নানা নূতন ব্যবহার চালু হয়েছে। ফ্যাক্স যন্ত্র ভাড়া দেওয়া শুরু হয়েছে। সেখান থেকে যে কোন লোক ফ্যাক্স ব্যবহার করতে পারে—যেমন পাব্লিক ফোন বা জেরক্স করার মেশিন আজকাল সর্বত্র দেখা যায়। ফ্যাক্সগুলি অনেকক্ষেত্রে ফোন এবং কপি করার দ্বিবিধ যন্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। গাড়িতে বসানর উপযুক্ত ছোট ফ্যাক্সও আজকাল তৈরী হচ্ছে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে স্কুলের ছেলেমেয়েরা একে অন্যের সঙ্গে ফ্যাক্সের মাধ্যমে পড়াশুনার নোট বিনিময় করছে অথবা বাড়ীর গিন্নিরা রন্ধনপ্রণালী চালাচালি করছে। ফ্যাক্সের ব্যবহার যে কত বিচিত্র হতে পারে তা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আধুনিক দ্রুতগতির বাণিজ্যিক জগতে ফ্যাক্সের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়বে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

37/2, গড়িয়াহাটা রোড (সাউথ) কলকাতা-700031।

জেনে রাখা ভাল

এক : আদর্শ পানীয় জল

ভারতের জল পরিকল্পনা দপ্তর আদর্শ পানীয় জলরূপে তাকেই চিহ্নিত করেছে—যার PH মান 7, অভিস্রবণ জনিত চাপ 5 বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান এবং প্রতি দশলক্ষ ভাগে লোহা 0·1 ভাগ, লবণ 500 ভাগ, ক্লোরাইড, সালফেট ও খরতা থাকবে 200 ভাগ করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যেভাবে জল দূষণ হচ্ছে তাতে পানীয় জল হিসেবে ভুগর্ভস্থ অথবা কর্পোরেশনের জলকে ফুটিয়ে এবং পরে তাকে ঠাণ্ডা ও ফিলটার করে পান করা উচিত। ফ্রিজের মধ্যে রাখা অত্যধিক ঠাণ্ডা জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

দুই : নিষিদ্ধ ওষুধ

(1983 সালে ভারত সরকারের নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা অনুযায়ী)—(1) অ্যামাইডো পাইরিন, (2) প্রেকটলল, (3) মেথাকোয়ানল, (4) নিয়ালামাইড, (5) টেট্রাসাইক্লিনের ও অক্সিটেট্রাসাইক্লিনের তরল মিক্সচার, (6) ডেসিকো-সাইক্লিনের তরল মিক্সচার, (7) পেনিসিলিনের চোখের ও ত্বকের মলম, (8) ফেনাসিটিন, (9) মেথাপাইরিলিন ও তার লবণ, (10) পেনিসিলিনের সঙ্গে সালফোনামাইডের সংযোগী ওষুধ, (11) ভিটামিন ও অ্যানালজেসিকের সংযোগী ওষুধ, (12) টেট্রাসাইক্লিন ও ভিটামিনের সংযোগী ওষুধ, (13) ক্লোরামফেনিকলের সঙ্গে স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতির সংযোগী ওষুধ, (14) ভিটামিনের সঙ্গে যক্ষ্মা নিরোধকের ওষুধ, (15) আরগটের সহযোগী ওষুধ, (16) হাঁপানী ছাড়া স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের মিশ্রণ, (17) অ্যান্টি হিস্টামিনিক ওষুধের সঙ্গে পায়খানার ওষুধের মিশ্রণ, (18) সোডিয়াম ব্রোমাইডের সঙ্গে অন্যান্য ওষুধ, (19) লৌহঘটিত ওষুধের সঙ্গে স্ট্রিকনিন ও আর্সেনিক, (20) ভিটামিনের সঙ্গে প্রদাহ দমনকারী ওষুধ, (21) অ্যাট্রপিন ও ব্যাথা উপশমের ওষুধের সঙ্গে জ্বর নিবারণের ওষুধ, (22) টনিকের সঙ্গে স্ট্রিকনিন ও ক্যাফিনের মিশ্রণ, (23) ইয়োহিম্বিন ও ক্যাফিনের সঙ্গে টেস্টোটেরন ও ভিটামিনের মিশ্রণ, (24) হাইড্রোক্সি কুইনোলিন জাতীয় ওষুধ।

বাজারে বহুল প্রচলিত অ্যানালজিন, বেরালগান প্রভৃতি ব্যথা উপশমের ওষুধ ; অ্যাসপ্রো, অ্যানাসিন প্রভৃতি মাথা-ধরার ওষুধ ; ডায়াবল, ডুরাবলিন প্রভৃতি পেট ভাল রাখার ওষুধ, এনটারোকুইনল, ম্যাক্সাফর্ম প্রভৃতি পেটের গোলমালের ওষুধ ; যে কোন কফের সিরাপ ব্যবহার করা উচিত নয়।

তিন : একটি গাছের প্রকৃত মূল্য

(ক) পরিবেশকে যত দূষণমুক্ত করে কৃত্রিমভাবে করতে গেলে খরচ— 5 লক্ষ টাকা।

(খ) জলের আবর্তন চক্র ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের মূল্য— 3 লক্ষ টাকা।

(গ) ভূমির ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধির মূল্য— $2\frac{1}{2}$ লক্ষ টাকা।

(ঘ) অক্সিজেন তৈরির মূল্য — $2\frac{1}{2}$ লক্ষ টাকা।

(ঙ) জীবজন্তুর জন্য প্রোটিন তৈরি ও অন্যান্য— 2 লক্ষ টাকা।

মোট 15 লক্ষ টাকা।

ভাববার কথা : পরিবেশ সম্বন্ধে যাঁরা অভিজ্ঞ বলে দাবী করেন, তাঁদের অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে মাইক বাজান, বোমা পটকা ফাটান এবং আবির নামের রাসায়নিক বিষ ছড়ান। তা কি উচিৎ?

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত

বিজ্ঞানীর টুকিটাকি

টমাস আলভা এডিসন

ট্রেনে যাত্রীদের মালপত্র রাখার যে খুপরি, তার ভিতরে ছোট্ট ছাপখানা বসিয়েছেন 14 বছরের একটি ছেলে। লেডিজ রুমালের মাপে তিনি খবরের কাগজ ছেপে সে নিজেই যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে। আর এ কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে সে এক্সপেরিমেন্ট করে নিজের খুপরিতে বসে। এতে তার দারুন মজা লাগে। একদিন তো ফসফরাস নিয়ে পরীক্ষা চালানোর সময় কামরায় আগুন ধরে গেলো। লোকজন ছুটে এসে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল বটে, কিন্তু জিনিসপত্র সহ ছেলেটাকে নামিয়ে দিল ট্রেন থেকে। এই ছেলেটিই কিন্তু পরে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বলে নাম করেছিলেন। নাম তার টমাস আলভা এডিসন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

আমেরিকার প্রিস্টন শহরে উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে স্থায়ী ভাবে বাস করার জন্যে আইনস্টাইন কে একটি বাড়ী দেওয়া হয়েছে। এর কিছুদিন পরে, প্রিস্টন কলেজের ডীনের অফিসে টেলিফোন করে এক ভদ্রলোক প্রথমে তার খোঁজ করলেন, ডীন ঘরে নেই শুনে তাঁর সচিবের কাছে ডঃ আইনস্টাইনের বাসার ঠিকানা জানতে চাইলেন। সচিব সবিনয়ে জানালেন, ডঃ আইনস্টাইন নিরিবিলি থাকতে চান বলে তাঁর ঠিকানা কাউকে দেওয়া বারন আছে। অপর প্রান্তে ভদ্রলোক গলাটা নামিয়ে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন, আপনাকে চুপি চুপি বলছি আমি ডঃ আইনস্টাইন। একটু বেরিয়েছিলাম, ফেরার সময় বাসার ঠিকানাটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

মানস কুমার চিনি

ডাক—মেচেদা, মেদিনীপুর-721138

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে লেখকদের জন্য জ্ঞাতব্য

1. কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মান উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।
2. লেখা হবে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে ফুলস্কেপ কাগজের এক পিঠে। পাশে মার্জিন থাকবে।
3. লেখার মধ্যে একই বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে।
4. লেখায় ইংরেজি সংখ্যা সূচক (English numericals) ব্যবহার করতে হবে।
5. ভাষা হবে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি।
6. তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত গ্রন্থ বা পত্রিকার নাম উল্লেখ করতে হবে লেখার শেষে।
7. লেখার সঙ্গে আঁকা ছবি এবং আলোকচিত্র পাঠালে ভালো হয়। ছবি আঁকতে হবে সাদা ও কালোতে।
8. কি বিষয়ের লেখা—লেখার উপরে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
9. পাণ্ডুলিপি ফেরৎ যোগ্য নয়, এজন্য লেখা পাঠাতে হবে কপি রেখে।
10. পত্রিকার প্রয়োজনে সম্পাদক লেখার যে-কোন অংশ বিশেষ গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করে প্রকাশ করতে পারবেন।
11, লেখা ও মডেল বিষয়ে যাঁরা লেখা ও মডেলের চিত্র পাঠাবেন তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন যে লেখায় বা মডেলে কোন অনুকরণ বা ভুল তথ্য পরিবেশন না করেন। কপিরাইট আইন প্রসঙ্গেও সম্পাদকের কোন দায়িত্ব নেই। প্রকাশিত রচনার বক্তব্যের ও অন্যান্য দায়িত্ব লেখকের।
12 লেখকদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক (জ্ঞান-বিজ্ঞান) লেখা প্রকাশে আমরা আগ্রহী।

নিষ্ক্রিয় মৌল ঃ হিলিয়াম

ষষ্ঠীপদ কবিরাজ

তোমরা হয়তো অনেকে জানো না এই নিষ্ক্রিয় মৌল হিলিয়াম আমাদের দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন বৃটিশ জ্যোতির্বিদ N. R. Pogson এবং ফরাসী জ্যোতির্বিদ J. Janssen 1868 সালের 18ই আগষ্ট মৌসুলীপট্টনমে পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় পর্যবেক্ষণ করতে করতে তারা খুবই আশ্চর্য হলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন সৌর বর্ণালীতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণালী রেখা। তাঁরা দেখলেন এই হলুদ বর্ণালী রেখা সোডিয়াম বাষ্পের হলুদ বর্ণালী রেখার সঙ্গে খুবই নিকট সম্পর্কিত কিন্তু একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিশিষ্ট। সুতরাং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে হলুদ রেখা কোন নতুন মৌল যা সূর্যের মধ্যে আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এখনো অজ্ঞাত, তারই পূর্ব সঙ্কেত। তারা তখন এর নাম রাখলেন হিলিয়াম। গ্রীক ভাষায় সূর্যকে হিলিয়স বলা হয়, আর তার থেকেই নামকরণ করা হল হিলিয়াম। এর পরবর্তী 30 বৎসর ধারনা ছিল যে এই মৌল শুধুমাত্র সূর্যের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব।

1895 খ্রিষ্টাব্দে Sir William Ramsay তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়ামের আকরিক ক্লেভাইট নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে যদি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড সহ ঐ আকরিকটিকে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে একটি বিশেষ ধরনের গ্যাস বের হয়। উক্ত গ্যাস সহজে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না এবং আগুণ জ্বলতে সাহায্যও করে না। তাই তিনি ভাবলেন এই গ্যাসটি নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন। কিন্তু তিনি খুবই অবাক হলেন যখন দেখলেন ওই গ্যাসের বর্ণালীতে পূর্বের মতো উজ্জ্বল বর্ণালী রেখা রয়েছে এবং এগুলিও আগের মতো হলুদ বর্ণের। এই পরীক্ষা তাকে দুটি সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করল। প্রথমতঃ হিলিয়াম পৃথিবীতে অবশ্যই আছে, দ্বিতীয়তঃ উক্ত গ্যাসের তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এরপর এই ঘটনা মোটামুটি ভাবে চাপা পড়ে যায় এবং শুধুমাত্র পরীক্ষাগারে কৌতুহলের বিষয় হয়ে থাকে।

সেই সময় আমেরিকায় কানসাস রাজ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য অনুসন্ধান করা হচ্ছিল এবং গৃহে গৃহে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাইপ লাইন বসানো হচ্ছিল। কিন্তু গ্যাসব্যবহারকারীরা প্রত্যেকে খুবই আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলেন যখন তারা দেখছিলেন যে ঐ গ্যাস দ্বারা আগুন জ্বালানো যাচ্ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ছুটে এলেন এর কারণ নির্ণয়ের জন্য। তারা এই গ্যাসেয় নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা করলেন এবং খুবই বিস্মিত হলেন যখন দেখলেন ঐ গ্যাসের মধ্যে শতকরা দুই ভাগ হিলিয়াম মিশ্রিত অবস্থায় আছে যার ফলে ওতে আগুন ধরছে না কারন হিলিয়াম নিজে অদাহ্য। এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে হিলিয়াম আছে।

হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার হওয়ার বাইশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ 1917 সাল পর্যন্ত মাত্র তিরিশ লিটার হিলিয়াম সংগৃহীত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে এই মৌলের ব্যবহারের বিভিন্ন দিক খুঁজে পেলেন। আমেরিকার টেকসাসে অনুসন্ধানের ফলে এক বিরাট হিলিয়ামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাণ্ডার থেকে 4250 কিলোলিটার হিলিয়াম সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফলে এর দাম প্রতি কিলোলিটার 88000 মার্কিন ডলার থেকে কমে 18 মার্কিন ডলার হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে এর ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার 36 মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে চারটি হিলিয়াম নিষ্কাশনের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। বর্তমানে এর বেশীর ভাগ সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। অবশ্য মোনাসাইট আকরিককে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা উত্তপ্ত করেও এই গ্যাস পাওয়া সম্ভব।

হিলিয়ামের ধর্ম অন্যান্য মৌলের ধর্মের থেকে পৃথক। বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন ঠিকই কিন্তু অদাহ্য এবং কোন মৌলের সঙ্গে বা যৌগের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। তাই একে নিষ্ক্রিয় মৌল বলা হয়। পর্যায়-সারণীতে একে স্থান দেওয়ার জন্য নতুন করে একটি গ্রুপ সৃষ্টি করা হল যার নাম শূন্য গ্রুপ।

হিলিয়ামের একটা আশ্চর্য রকমের ব্যবহার আছে। যদি তরল হিলিয়াম ভর্ত্তি রেকাবীতে একটি খালি কাপ রাখা যায় তাহলে হিলিয়াম কাপের গা বেয়ে উঠতে থাকবে এবং কাপকে ভর্ত্তি করে ফেলবে। এই তরলের মধ্যে আঙুল ডুবালেও কোন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। এই হোল হিলিয়াম।

এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে। গভীর সমুদ্রে ডুবুরীদের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেনের সঙ্গে হিলিয়াম (80%—20%) মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়। যদি

সাধারণ বায়ু ব্যবহার করা হয় তাহলে তাতে যে নাইট্রোজেন আছে অথবা অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপ বাড়ায় নাইট্রোজেন রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। আবার ডুবুরী উপরে উঠে এলে চাপ কমে যাওয়ার ফলে রক্ত থেকে নাইট্রোজেন পুনরায় বুদবুদের আকারে মুক্ত হতে থাকে। ফলে প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ডুবুরীদের গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধানের কাজে বহু সময় যাবৎ থাকতে হয়।

ডাক্তাররা হিলিয়াম অক্সিজেন মিশ্রণ ব্যবহার করে শতকরা 90 জন হাঁপানী রোগীকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শুধুমাত্র ওষুধ ব্যবহার না করে ওষুধের সঙ্গে হিলিয়াম-অক্সিজেন মিশ্রণ খুবই ফলপ্রদ! শ্বাসনালী প্রদাহ (bronchial infection) রোগীদের ক্ষেত্রে পেনিসিলিন ও হিলিয়াম একসঙ্গে ব্যবহার করে উপকার পাওয়া গেছে। T. B. রোগীদের ক্ষেত্রে হিলিয়ামের ব্যবহার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান দিয়েছে। রোগীদের অস্ত্রোপচারের সময় চেতনানাশক হিসাবে হিলিয়াম এগিয়ে এসেছে, কারণ এর কোন বিষক্রিয়া নেই।

হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী কেমারলিংগ ওনেস লক্ষ্য করলেন বিসমাথ, টিন প্রভৃতি ধাতু এবং নাইয়োবিয়াম-টিন, নাইয়োবিয়াম-ট্যান্টালাম প্রভৃতি ধাতু সংকরকে তরল হিলিয়ামের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে ওদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে কোন বাধার (Resistance) সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ উহাদের রোধ শূন্যতে পরিণত হয়। পদার্থের এই ধর্মকে বলা হয় অতি পরিবাহিতা (Superconductivity)। এই অতি-পরিবাহীতাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা অতি শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে ট্রেনকে ঘণ্টায় 500—600 km বেগে চালানো সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ খরচ কমানো যাবে বহুলাংশে। এছাড়া ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে এটা একটা খুব বড় আশীর্বাদ।

সর্বশেষে একটা কথা বলতেই হয় যে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন আকাশে যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে—এদের জ্বালানী হিসাবে হিলিয়ামের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাম—জপমালী, পোঃ—জপমালী জেলা—বাঁকুড়া
পিন—722143.

বিজ্ঞানের খবর সিদ্ধার্থ সরকার

মহাকাশে ক্যান্সার

ক্যালিফোর্নিয়ার একজন বিজ্ঞানী এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, বহির্মহাকাশে যেসব তেজস্ক্রিয় কণা রয়েছে সেগুলো থেকে যাঁরা দীর্ঘদিন মহাকাশে থাকবেন তাঁদের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিজ্ঞানীর নাম ট্রেসি ইয়ান। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, "পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই তেজস্ক্রিয় কণাগুলো পশুর কোষের সাংঘাতিক রকম ক্ষতি করেছে। তবে তিনি একসঙ্গে এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে এই ঝুঁকি কমানোর একটা উপায় পদার্থ বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই বের করতে পারবেন।

বুদ্‌বুদ্ চিকিৎসা

আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ওষুধপত্রের ক্ষেত্রে যত উন্নতিই হোকনা কেন. বহু ওষুধেই এখন অনেক মারাত্মক ত্রুটি রয়েগেছে। যেমন, রক্তস্রোত দ্রুত ওষুধগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে শরীর থেকে বের করে দেয়। তাছাড়া বহু ওষুধের তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন—খুব জ্বর হয়, কিংবা কিডনী, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড জখম করে দেয়। এখন অনেক গবেষণা করে দেখা যাচ্ছে যে, রসায়নাগারে প্রস্তুত একরকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্, যা অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না, সেগুলো যদি ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে শরীরের যে অংশে দরকার সেখানে ইংজেকশান করে দেওয়া হয় তাহলে সুফল ফলতে পারে। এই বুদ্‌বুদের নাম লিপোসম। দেহকোষের ঝিল্লী তৈরির কাজে লাগে যে অম্লরস, তা দিয়েই লিপোসম তৈরি হয়। এই বুদ্‌বুদ্ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি রাজ্যের লিপোসম কোম্পানী। এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান এডগার ম্যাক্স জানান,, "লিপোসমগুলো শরীরে ঢোকামাত্র জঙ্গীকোষগুলো তা খেয়ে ফেলে এবং তারপর রক্তস্রোতের সঙ্গে সেগুলো চলে যায় শরীরের সেইস্থানে, যেখানে রোগ হয়েছে। তিনি জানান, বাইরের কোন জীবাণু কোনভাবে শরীরে ঢুকে পড়লে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অতিদ্রুত তাকে রক্তস্রোতের বাইরে করে দেয়। কখনও কখনও কোন না কোন জীবাণু শরীরে ঢুকেই পড়ে, সেগুলোর সঙ্গে লড়াই করার জন্য শরীরে বেশ কিছু জঙ্গীকোষ থাকে। এই কোষগুলো শিরা বা ধমনীর মাধ্যমে শরীরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই যখনই লিপোসম ইংজেকশান করে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তখনই জঙ্গীকোষগুলো ছুটে এসে তা খেয়ে ফেলে। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে সেগুলো পৌঁছে যায় সংক্রামিত অংশে। বলা বাহুল্য, এতে বেশ কাজ হয় এবং ক্ষতির বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। চিকিৎসকরা বলেন চোখে, হৃদপিণ্ডে, ফুসফুসে কিংবা কিডনীতে কখনই বেশি ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়; একেবারে না করতে পারলে তো খুবই ভালো হয়। লিপোসম প্রয়োগের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মডেল বানাতে গিয়ে ঃ চার

রাজেশ গিরি

কোড কম্বিনেশন লকিং সিস্টেম

অফ্‌ অবস্থায় রিলের যে দুটো পয়েন্ট খোলা থাকে তাদের বলা হয় নর্মালি ওপেন কন্টাক্ট (N/O) এবং যে দুটো পয়েন্ট জুড়ে থাকে তাদের বলা হয় নর্মালি ক্লোজড্‌ কন্টাক্ট (N/C)। এদের মধ্যে একটা পয়েন্ট থাকে কমন অর্থাৎ

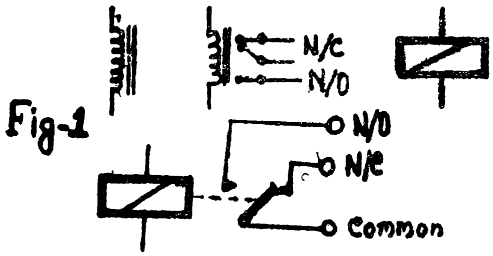

Fig-1

পয়েন্ট থাকে মোট তিনটে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্কিট ডায়াগ্রামে রিলের এই পয়েন্টগুলি এঁকে দেওয়া থাকে অথবা থাকে না। সার্কিট ডায়াগ্রামে রিলের বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

রিলের N/O, N/C অবস্থা এবং টাইমার সার্কিটের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাপ থাকা এবং তার পর অফ্‌ লক্‌ পাওয়া যায় তাতে কতগুলো ডিস্ক্‌ ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট কম্বিনেশনে নিয়ে গেলে তালা খুলে যায়। ডিজিটাল ইলেক্‌ট্রনিক্সের উপর ভিত্তি করেও এই ধরনের লক্‌ তৈরি হয়েছে তবে এ গুলোর নির্মাণ ব্যয় বহুল, ফলে দাম খুব বেশি।

আমার এই লকটা তৈরি করতে খরচ এর তুলনায় অনেক কম এবং কাজে কোন অংশে কম নয়।

কি কাজ করে ঃ

এই লকিং সিস্টেম এমন ভাবে তৈরি যাতে মালিক ছাড়া অপর কেউ তালাটা খুলতে না পারে। চোর যদি এই তালা খোলার চেষ্টা করে তবে সে ব্যর্থ তো হবেই তাছাড়া একটি সাইরেণ বেজে উঠে, জানিয়ে দেবে অপর কেউ তালাটা খোলার চেষ্টা করছে এবং এর পর এক্সট্রা সেফিং ব্যবস্থা একটা এক্সট্রা লক্‌ করে দেবে যাতে কোন অবস্থাতেই ঐ তালা আর খোলা না যায়, এবং এর পর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ঐ লক্‌ অটোমেটিক ভাবে সাধারণ অবস্থায় চলে আসবে।

এই সার্কিট পাঁচটি ইউনিট নিয়ে গঠিত, ইউনিটগুলি হল ঃ

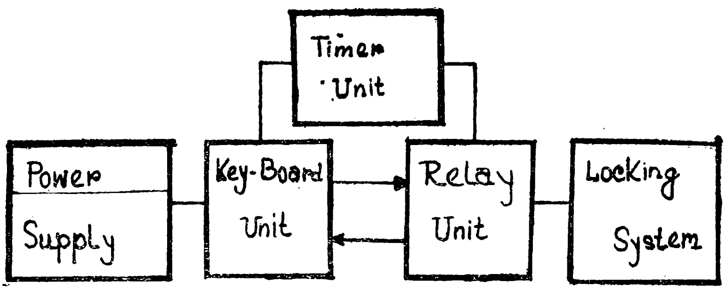

Fig-2 Block Diagram

হয়ে যাওয়া এই ধর্মগুলো কাজে লাগিয়ে একটা সুন্দর মডেল তৈরি করা যেতে পারে। মডেলটার নাম দিয়েছি 'কোড্‌ কম্বিনেশন লকিং সিস্টেম'। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা এমন একটা তালা যা নির্দিষ্ট কম্বিনেশনে কোড কম্প্লিট না করলে খুলবে না। বাজারে যে মেকানিক্যাল কোড কম্বিনেশন

1. পাওয়ার সাপ্লাই, 2. কি-বোর্ড ইউনিট, 3. রিলে ইউনিট 4. টাইমার ইউনিট, 5. লকিং ইউনিট।

সার্কিটটাকে ব্লকের আকারে আঁকলে কেমন হবে উপরে দেখানো হল

ঘোড়াধরা, ঝাড়গ্রাম-721507।

মডেল-এর রকমফের

নির্মলেন্দু বিকাশ পাত্র

কণ্টিন্যুইটি টেস্টার

ইলেকট্রনিকস ল্যাবেতে বিভিন্ন মডেল বানানোর সাথে একটা Continuity tester বানালে কেমন হয় ? এই ধরনের টেস্টারের সাহায্যে তোমরা বিভিন্ন সার্কিট বা কম্পোনেন্ট এর Continuity তো চেক করতে পারবেই, তাছাড়াও এর সাহায্যে ট্রানজিসটার ইত্যাদি চেক করা যাবে। অন্যান্য সার্কিটের সাথে আমার এই সার্কিটের একটা তথাৎ হল এই যে এই সার্কিটটা যে কোন কিছুর Continuity check তো করেই তাছাড়াও এর সাহায্যে CUT [Component under testing] এর Resistance এর সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে। এই মডেলের সাহায্যে

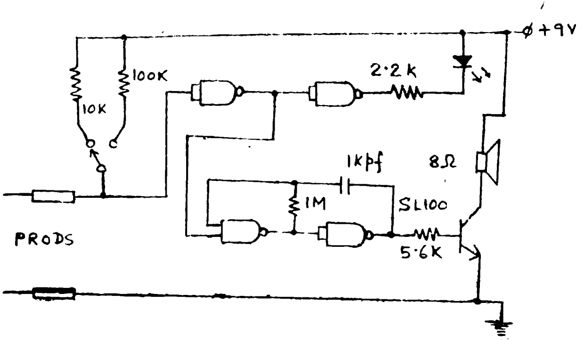

Audio ও Visual দুটো Indication-ই পাওয়া যাবে। সার্কিটে দেখ প্রথমেই একটা SPDT [Single pole double throw] সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাহায্যে দুটো Resistance এর যে কোন একটার Lead-এ গ্রোব ঠেকে থাকবে। যে কম্পোনেন্ট চেক করা হচ্ছে তার Resislance যদি ওপরেরটার (যেটার সাথে SPDT সুইচের পোল লাগানো আছে) চেয়ে কম হয় তবে স্পিকারে আওয়াজ শোনা যাবে এবং LED জ্বলবে। সার্কিট লক্ষ্য করলে দেখবে মোট তিনটে NAND GATE এর দুটি INPUT SHORT করা হয়েছে। এর ফলে যে জিনিস পাওয়া যায় তাকে বলা হয় NOT GATE বা HEX INVERTER। শেষের একটা HEX INVERTER ও একটা NAND GATE এর সাহায্যে একটা Audio Frequency Oscillator তৈরি করা হয়েছে যার কন্টোল ইনপুট আগের INVERTER এ লাগানো হয়েছে। প্রথম GATE এর INPUT এ $\frac{V}{2}$ এর চেয়ে কম ভোল্টেজ-হলেই সেটা 'O' input বলে গণ্য করা হয় এবং ওর output হয় 'I'। ফলে পুরো সার্কিটটি চালু হয়। এই সার্কিট ব্যাটারীতে চালানো উচিত। নাহলে এলিমিনেটারে চালালে False triggering হতে পারে। সার্কিটে SPDT এর জায়গায় Multi Pole সুইচ লাগানো যেতে পারে। এই ধরনের বেটারী লাগালে এমন কি Resistance এর মান সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। এছাড়া আগেই বলেছি এর সাহায্যে ট্রানজিসটার, ডায়োড ইত্যাদি টেস্ট করা যেতে পারে। ট্রানজিসটার চেক করার সময় এটাকে দুটো ডায়োডের সমন্বয় হিসাবে ধরতে হবে। আর ডায়োড চেকিং-এর পদ্ধতিতো তোমাদের জানা আছেই।

পোঃ চামড়াইল, হাওড়া

জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত

নিজে নিজে কর

প্রথম খণ্ড ॥ তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রথম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম দশ টাকা

প্রতিখণ্ডে প্রায় অর্ধশত মডেলের সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ নির্মাণ প্রণালীর ব্যাখ্যা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ॥ ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৫

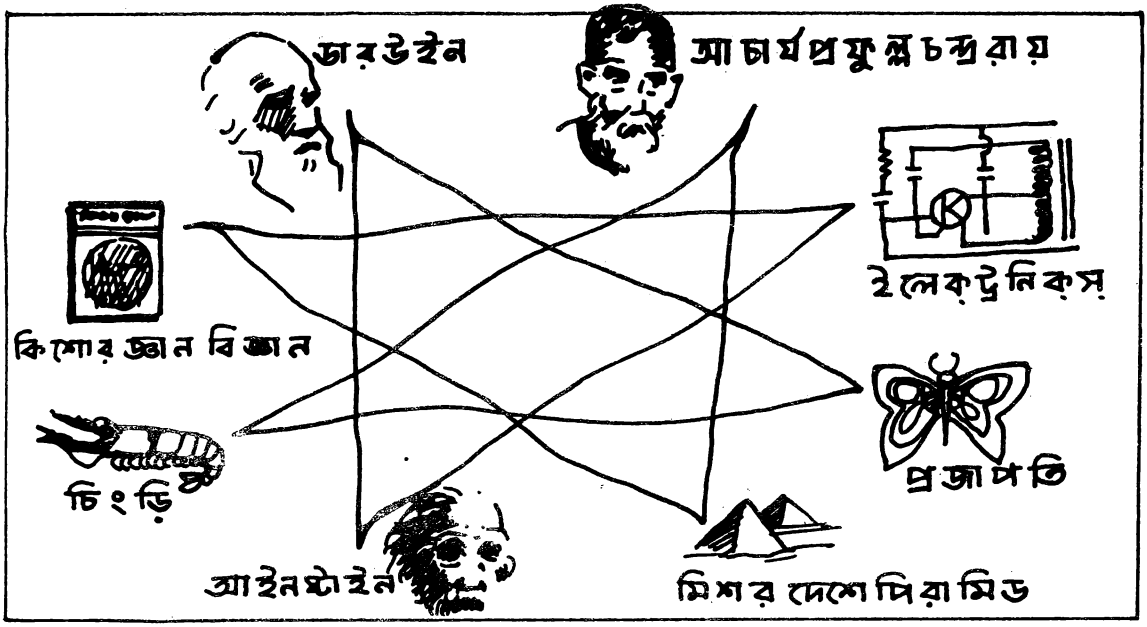

ম্যাজিকের বানান

এবারে একটা মজার খেলা শেখাবো। ম্যাজিকের মত এই খেলাটি তোমার বন্ধুকে দেখিয়ে মজা পাবে। নানা বিষয়ে ছবি আছে এখানে। তোমার বন্ধুকে বলো মনে মনে একটা ছবি ভাবতে। তারপর তুমি আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে একটা করে ছবি ছোঁবে। বন্ধু করবে কি—ধীরে প্রতিটি আঙ্গুল ছোঁয়াবার সময় তার মনে করা ছবিটার বানান বরবে। অর্থাৎ একটি ছবি ছোঁয়া মানে একটি অক্ষর। এইভাবে চলতে চলতে বন্ধুর বানানের শেষ অক্ষর যে ছবিতে পড়বে সেখানে তোমার আঙ্গুল ছোঁয়ার সময় বন্ধু বলবে STOP। সেটাই তার মনে মনে ভেবে রাখা ছবিটা।

তোমাকে কী করতে হবে? মিশর দেশে পিরামিড ছবিটা থেকে তুমি শুরু করবে প্রথমে। তারপর ডানদিকে লাইনটা ধরে ওপরে যেখানে লাইনের শেষ সেখানকার ছবিটা দ্বিতীয়। তারপর সেই ছবি থেকে অন্য লাইনটা গিয়ে যেখানে শেষ সেটা তৃতীয়। এইভাবে যতক্ষণ পুরো বানান শেষ না হয় ততক্ষণ একটি অক্ষরের জন্য একটি ছবি ছুঁয়ে চলতে হবে। মনে রেখো একটি অক্ষর মানে স্বর চিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর থাকলে সেগুলো সমেত ধরতে হবে। যেমন কি শো র জ্ঞা ন বি জ্ঞা ন।

খেলাটি শিখে খেলার পর একঘেয়েমী লাগলে ছবিগুলো পাল্টে তোমরা আরো নিজের মত বানাতে পারো। সেক্ষেত্রে যে ছবিটির জায়গায় নতুন ছবি বসাবে সেখানে আগের ছবির বানানের সমান অক্ষর সংখ্যা নিয়ে অন্য বানান বসাতে হবে।

বুদ্ধি শুদ্ধি

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

বুদ্ধিশুদ্ধি : হাতে কলমে আধ ডজন এর সমাধান

(1) একটির মুখে কাঁচিটি বেঁধে দুলিয়ে দাও। অন্যটি ধরে এগিয়ে এসো পরে দোল খাওয়া কাঁচি ধরে ফেল (2) কম্বলের এক প্রান্ত থেকে গোল করে গুটিয়ে এসো। বোতলের গায়ে লাগার পরও গুটিয়ে চলো। পুরো কম্বল গোল করে গুটিয়ে ফেল দেখবে বোতল বাইরে চলে আসবে, হাত লাগাতে হবে না। (3) ঘরের দরজাটা আধেক খোলো। দরজার কাঠের তলায় কাগজের টুকরো এমনভাবে রাখো যাতে দুপাশে সমান হয়। এবার কাঠের দুদিকে দুজন দাঁড়াও কেউ কাউকে ছুঁতে হবে না। (4) আকাশের দিকে ছোঁড়ো (5) দড়ির মাঝখানে একটি গিট লাগিয়ে কাপ ঝোলাও। গিটটার মাঝখানে কাটো। (6) ছবি দেখে বুঝে নাও।

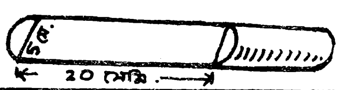

জুলাই '89 VII-VIII

1. কত সালে পণ্ডিচেরী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ?

2. ভারতের তখন রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ?

3. আগামী কত সালে আবার হ্যালির ধূমকেতু দেখা যাবে ?

4. ভারতের কোন হকি খেলোয়াড় প্রথম পদ্মশ্রী উপাধি পান ?

5. 'হর্স্‌পোলো' খেলায় ব্যবহৃত ব্যাটের নাম কি ?

6. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে কোন শিলার নামকরণ হয়েছে ?

7. কোন দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দেয় ?

8. নীচের প্রাণীটির পরিচয় দাও ?

9. দিল্লীর 'কুতব মিনার' কে তৈরি করেন ?

10. পুলিকট হ্রদ ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত ?

জুলাই '89 IX-X

1. yak কি ?

2. কাবেরী নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে ?

3. রোমান সংখ্যা LXX-এর মান কত ?

4. নীচের ছবিটি কার বলো'ত ?

5. 'ক্লে পিজিয়ন' কথাটি কোন খেলায় ব্যবহৃত হয় ?

6. দানসাগর গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?

7. পরমাণুর মৌলিকত্ব কিসের উপর নির্ভর করে ?

8. কোন ভিটামিন ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে ?

9. ঘানার আগেকার নাম কি ছিল ?

10. গুরু নানকের জন্ম কোথায় হয় ?

জুলাই 89' XI-XII

1. কোন প্রাণী মনুষ্য জগতের সবচেয়ে বেশী ক্ষতিসাধন করে ?

2. কোন ভারতীয় মহিলা প্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন ?

3. কিছুকাল আগে ভূপালে কোন গ্যাস নির্গমনের ফলে বহু মানুষ মারা যান ?

4. কোন বিখ্যাত টেস্ট ক্রিকেটার 'Zed' নামে পরিচিত ?

5. আলি আকবর খান কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন?

6. নীচের ছবিটি কোন প্রাণীর ?

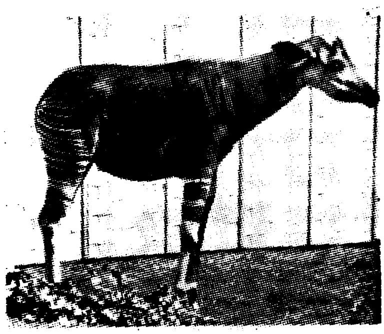

7. গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা কে লেখেন ?

8. চিউইং গাম প্রস্তুত করতে কোন গামের প্রয়োজন ?

9. Lamp of heaven কাকে বলা হল ?

10. বার্লি চাষের জন্য কি রকম জলবায়ুর প্রয়োজন ?

আবিষ্কারের গল্প

দূরবীন

জিজ্জার পিসেমশাই একটা ছোট্ট খেলনা দূরবীন দিয়েছিল ওকে গত জন্ম দিনে। আজ সারা দিন সেটা চোখে লাগিয়ে "কাকু তোমাকে কত কাছে দেখাচ্ছে।" "বাপি তোমায় কত দূরে দেখাচ্ছে'—এই করে বেড়াচ্ছে। মা বারণ করা সত্ত্বেও শোনেনি। এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই এসব চলছিল। হঠাৎ জিজ্জার খেয়াল হল বাইরেটা, আকাশটা কেমন লাগে দেখতে হবে। চোখে দূরবীনটা লাগানো অবস্থাতেই আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল। আমি বললুম। খুব একটা সন্তুষ্ট হল না আমার কথায়। ঐ অবস্থাতেই দৌড়ে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার কানে এল পতনের শব্দ এবং জিজ্জার কান্না। ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়েই আমি বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। সিঁড়ির কানায় ঠুকে জিজ্জার থুতনিটা কেটে গেছে। আর তার ওপরে জিজ্জার মা দূরবীনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দুমদুমিয়ে কটা ঘা দিয়ে রান্না ঘরে ফিরে গেল। জিজ্জাকে বুকে তুলে নিয়ে দেখলুম কাটাটা তেমন কিছু না। একটু ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, কিরে গ᾿ া শুনবি? বাঁ হাতের উল্টো পিট দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল "হুঁ" — তবে শোন, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত লোকেরা জানত যে পৃথিবীর চার দিকেই অন্যান্য গ্রহরা ছড়িয়ে আছে। এই সময় ইটালীর এক অধিবাসী গ্যালিলিও জেনেছিলেন যে হল্যাণ্ডের হ্যান্স লিপার্শে নামের একজন বিজ্ঞানী একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যাতে দূরের জিনিস কাছে এবং বড় দেখায়। তিনি ভাবলেন আমাকেও এরকম একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে। প্রথমে তিনি তিনগুণ বড় দেখায় এমন একটি এবং পরে তিরিশগুণ বড় দেখায় এমন একটি দূরবীন তৈরি করলেন। গ্যালিলিওর তৈরি দূরবীনের বৈশিষ্ট্য হল, এটি প্রতিসারিত দূরবীন। এতে দুটো আতস কাচ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের দূরবীনের সাহায্যে গ্যালিলিও জানতে পেরেছিলেন যে চাঁদে পাহাড় আছে, বৃহস্পতির চারটে চাঁদ আছে এবং শনির চারদিকে একটা বলয় আছে। এই সব তথ্য এর আগে কেউ জানতে পারে নি। ততক্ষণে জিজ্জার কান্না থেমে গেছে। নরম স্বরে আমাকে আব্দার করল—"কাকু আমিও চাঁদের পাহাড় দেখব"।

অলয় ঘোষাল

মহঃ মিনহাজ উদ্দিন

পাশাপাশি ঃ

1. আকাশের অপর একটি নাম। 3. যে গাছ স্তম্ভমূলের সাহায্যে অনেকদিন বাঁচে। 4. অ্যাসিডের সঙ্গে ধাতুর বিক্রিয়ায় যে যৌগ উৎপন্ন হয়। 6. পরমাণুর যে কণা পজিটিভ তড়িৎগ্রস্ত। 8. তড়িৎগ্রস্ত পরমাণু বা মূলক। 9. যে যন্ত্রের ইংরেজী নাম (RADIO)। 10 অ্যালকোহল যুক্ত একটি পানীয় যাহা শরিরের পক্ষে ক্ষতিকর। 11. শরীরের যে অংশ কাটলে ব্যাথা লাগে লাগে না।

উপর নিচ ঃ

2. সৌর জগতের নবতম গ্রহ। 3. পশ্চিম জার্মানির রাজধানী। 5. আলোর কণা। 7 একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। 8. একটি চৌম্বক পদার্থ। 9. হিন্দুদের একটি ধর্মপুস্তক।

40/B, ডি. ভি. সি কলোনী, বর্ধমান-3

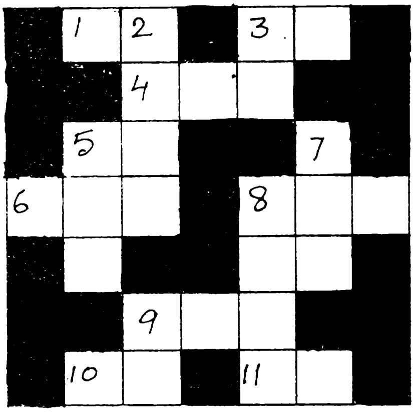

আই কিউ টেস্ট জুলাই 1989

1. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি কত—

6	8	7
36	64	49
24	48	?

2. সমস্ত অয়শ্চৌম্বক পদার্থ (ferromagnetic materials) একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় চুম্বকে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা হারায়! যে উষ্ণতায় এটি ঘটে তাকে কী বলে?

3. নিচের কোনটি তড়িতের সুপরিবাহী নয়–
(a) গলিত NaCI, (b) কঠিন NaCI,
(c) NaCI-এর জলীয় দ্রবণ।

4. মটরশুঁটির আকর্ষ রূপান্তরিত হয়েছে—
(a) কাক্ষিক মুকুল থেকে, (b) যৌগিক পত্র থেকে,
(c) অস্থানিক মূল থেকে।

5. 1812 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্যে কে কোন কমিশন নিয়োগ করেন?

ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

মে '89 VII—VIII-গ্রেড-1-এর সমাধান

1. প্রতিবছর 7th নভেম্বর তারিখে। 2. রবার্ট কখ। 3. ঐ পাখি দুটি বর্তমানে অবলুপ্ত, কাজেই কোন দেশেই দেখা যায় না। 4 বিস্ফোরক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা আছে। 5. 1986 সালের 19th March তারিখে তোলা হ্যালির ধূমকেতুর ছবি। 6. দুটি পায়ের মধ্যে কোন না কোন পাকে সর্বদা মাটি স্পর্শ করে থাকতে হবে। 7. ফরাসী দেশের পদার্থ বিজ্ঞানী। 8. চার্লস লিণ্ডবার্গ। 9. জুম্মা মসজিদ। 10. বাল গঙ্গাধর তিলক। 11. একুশে জুন। 12. হীরাকুঁদ বাঁধ।

মে '89 IX-X গ্রেড II-এর সমাধান

1. বেলজিয়াম দেশের। 2. জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। 3. আফ্রিকার হাতি। 4. বুলিয়ান (Bullion)। 5. তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছবি। 6. জার্মানীর বুশম্যান (Buschman), আবিষ্কার কাল 1821 খ্রীষ্টাব্দ। 7. ড্রেডনট। 8. আর (are)। 9. Private Branch Exchange. 10 প্রতি বছর 5th সেপ্টেম্বর তারিখে। 11. Indian Naval Ship. 12. কোকিল।

মে '89 XI-XII গ্রেড-III-এর সমাধান

1. ক্যালোরিমুক্ত কৃত্রিম চিনি। সাধারণ চিনির চেয়ে এই চিনি 200 গুণ মিষ্টি। পৃথিবীর 20টি দেশে এই চিনি বিক্রি হচ্ছে। 2. Mitochondrion কে। 3. TAXONOMY. 4. কমবে। 5. ট্রাইটিয়াম। 6. 4000 পাউণ্ড। 7. মনে করি C পাবে x ভাগ, B পাবে 3x, A পাবে 6x, $\therefore$ $6x+3x+x=660$ $\therefore$ $x=\frac{660}{10}=66$ টাকা (উত্তর)

8. নভেম্বর মাসের 19 তারিখে। 9. জাতকের কাহিনী। 10. ফুল। 11. গলফ। 12. তরল দুধকে কঠিন গুঁড়ো দুধে পরিণত করতে লাগে।

আই-কিউ-টেস্ট / মে 1989-এর সমাধান

1. 75 [$37=19\times2-1$ এবং $75=37\times2+1$]
2. (c) ডায়োড। 3. সিমলিপাল অভয়ারণ্য।
4. (c) গমের। 5. (b) বেরিয়াম।

শব্দকূট সমাধান

মজার এক্সপেরিমেণ্ট

পীযুষ কান্তি ভুঁড়ে

তরলের উপরে চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়। বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষা দ্বারা তা প্রমাণ করেছিলেন। আমরা একটু অন্যভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারি। এখন এখানে সেই পরীক্ষাটি বিবৃত করবো।

পরীক্ষা :

উপকরণ : (i) একটা (পাতলা প্রাচীরযুক্ত) কাচের শিশি,

(ii) একটা কর্ক যা শিশির মুখে ভালোভাবে আঁটা যায়,

(iii) একটা সরু নল,

(iv) কিছু গলান মোম ও

(v) কিছু পরিমাণ জল।

পদ্ধতি : সরু কাচের নলটির সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে কর্কে ছিদ্র ক'রে নলটি কর্কে ভালোভাবে ফিট্ করা হল। তারপরে কাচের শিশিতে $\frac{3}{4}$ অংশ জল ঢালা হ'ল, এখন সরু নল ফিট্ করা কর্কটি শিশির মুখে খুব ভালো ক'রে স্থাপন করা হ'ল তারপরে গলান মোম দিয়ে শিশিটি ভালো ক'রে বায়ু নিরুদ্ধ করা হ'ল। এর পরে মুখের মধ্যে নল দিয়ে ধীরে ধীরে শিশির থেকে বায়ু মুখের মধ্যে টেনে নিতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে শিশির প্রাচীর থেকে অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ উঠ্‌ছে সেই সঙ্গে জলটিও আলোড়িত হচ্ছে। তখন মনে হয় জলটি ফুটছে। এজন্য স্বাভাবিক তাপই যথেষ্ট। একটা মজার ব্যাপার যে, শিশির ভিতরের চাপ হঠাৎ ফিরিয়ে নিয়ে গেলে জলও হয়ে যায় স্থির। উল্লেখ্য যে, নলটির যে প্রান্ত শিশির মধ্যে থাকে সেই প্রান্তটি যেন জলের

উপরে থাকে এবং শিশির মধ্যে উল্লিখিত পরিমাণ জল ছাড়াও হতে পারে।

করঞ্জলী, 24-পরগণা (দঃ)

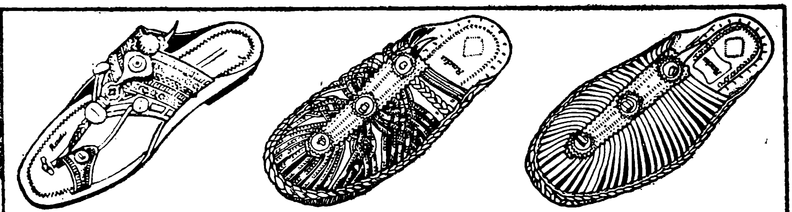
সুন্দর
ও মজবুত
জুতো মানেই
রাদু
Radu®
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
ESTD. 1901
75A, COLLEGE STREET CALCUTTA-700 073
PHONE: 31-2402
18, GARIAHAT ROAD, CALCUTTA-700 019
PHONE 42-8393

বলতে পারো কেন?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

উঃ। টি. এন. টি (T. N. T.)-এর পুরো নাম ট্রাই নাইট্রো টলুইন। এটি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ। দেখতে ফিকে হলুদ বর্ণের এবং কঠিন স্ফটিকাকার পদার্থ। টলুইন ($C_6H_5CH_3$) বিশেষ নাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হয়। (গাঢ় HNO_3 এবং গাঢ় H_2SO_4-এর মিশ্রণ টলুইনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে অর্থো ও প্যারা নাইট্রো টলুইন গঠন করে। অতিরিক্ত মিশ্র অ্যাসিড বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপন্ন করে ট্রাই নাইট্রো টলুইন [$C_6H_5(NO_2)_3$])। এর গঠনমূলক সঙ্কেত—

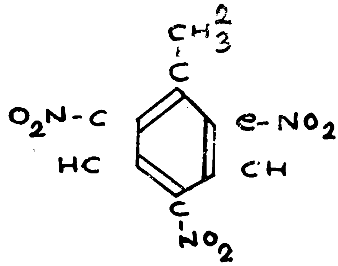

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন ঃ
আকাশকে নীল দেখায় কেন?

জানতে চেয়েছো (1) এস. ভারতী, করুই, বর্ধমান; (2) বিমলেন্দু সেন, সিটি বাজার কলোনী, কাঁচড়াপাড়া, উঃ 24-পরগণা; (3) অপর্ণা রায় ও অমর আহমেদ, উঃ 24-পরগণা।

প্রঃ। বোরাক্স কী? অংশুমান কর, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

উঃ। সোডিয়াম টেট্রাবোরেট ডেকাহাইড্রেট নামক দশ অনু কেলাস জল যুক্ত সোডিয়াম, বোরন ও অক্সিজেনের যৌগ ($Na_2B_4O_7$, $10H_2O$)। একে বাংলায় বলে সোহাগা। তিব্বত, সিংহল ও উঃ আমেরিকায় ওকে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে হলে কোলেম্যানাইট খনিজের চূর্ণকে ($Ca_2B_6O_{11}$, $5H_2O$) সোডিয়াম কারবনেটের সঙ্গে ফোটালে প্রথমে ক্যালসিয়াম কারবনেট, বোরাক্স ও সোডিয়াম মেটাবোরেট দ্রবণ উৎপন্ন হয়। অতঃপর ক্যালসিয়াম কারবনেটকে ছেঁকে নিয়ে পরিশ্রুতকে গাঢ় করলে বোরাক্স কেলাসিত হয়।

বোরাক্সকে উত্তপ্ত করলে ওর কেলাস-জল বাষ্পীভূত হয় এবং লবণটি খইয়ের মত ফুলে ওঠে। সোনা প্রভৃতি কোন কোন ধাতুকে বিশুদ্ধ করতে এবং তার মালিন্যকে শোধন করাতে বিগালক হিসেবে বোরাক্স ব্যবহার করা হয়। বিশেষ ধরণের কাচ প্রস্তুতিতে, এনামেল এবং মৃৎশিল্পের উপর চকচকে প্রলেপ দিতেও ওর দরকার হয়।

প্রঃ। ভিট্রিয়ল কী? সবুজ ভিট্রিয়ল কাকে বলে? মাইকেল নস্কর, গণেশ নগর, কাকদ্বীপ, 24-পরগণা।

উঃ। সাধারণতঃ ভিট্রিয়ল অর্থে দানা। দানাদার বিশেষ বিশেষ সালফেট লবণের রঙ অনুসারে কতকগুলো চলতি নাম আছে। যেমন জিঙ্ক সালফেটকে বলে হোয়াইট ভিট্রিয়ল, কপার সালফেটকে বলে ব্লু ভিট্রিয়ল এবং ফেরাস সালফেটকে বলে গ্রীন ভিট্রিয়ল।

সবুজ ভিট্রিয়ল তথা গ্রীণ ভিট্রিয়লের ফরমূলা $FeSO_4$, $7H_2O$। দেশীয় কথায় হীরাকস। লোহা কিংবা লোহার সালফাইডকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করালে ফেরাস সালফেট উৎপন্ন হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। কেলাসিত করলে $FeSO_4$, $7H_2O$-র কেলাস পাওয়া যায়। রঙ ঈষৎ সবুজ। তাই অনুরূপ নাম।

প্রঃ। দুটো চোখ থাকার সুবিধা কী। বাবুল হক, চাষপাড়া, গয়েশবাড়ী, মালদহ-2

উঃ। লক্ষ্য বস্তুর সাপেক্ষে দুটি চোখের অবস্থান এক নয়। এবং রেটিনায় গঠিত প্রতিবিম্বও এক হয় না। দুটি লক্ষ্য বস্তু দু-দুটি প্রতিবিম্বই গঠন করে, আর মস্তিষ্ক বিশেষ এক ব্যবস্থার মাধ্যমে দুটি প্রতিবিম্ব মিলিয়ে একটা একক প্রতিবিম্ব তৈরি করে নেয়। ঐ প্রক্রিয়াটির রহস্য উদ্ঘাটন এখনও সম্ভব হয়নি বলা যায়। তবে এটুকু জানা গেছে, বস্তুর প্রকৃত অবস্থান, পারস্পরিক দূরত্ব, বস্তু সম্বন্ধে ত্রিমাত্রিক

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ) ধারণা, গভীরতা, ইত্যাদি স্পষ্ট হয় দুটি চোখ থাকার জন্যই।

একটি মাত্র চোখের দ্বারা কোন বস্তুর সুস্পষ্ট ধারণা সম্ভব নয়। একটি চোখ বন্ধ করে কোন কাজ করতে গেলেই আমরা অসুবিধাটুকু বুঝতে পারবো। আসলে কোন বস্তুর উভয় দিকটা আমাদের উভয় চক্ষুর দ্বারাই পরিপূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে। অপর দিকে দুটি চোখের অবস্থানেরও কিছুটা তফাৎ আছে। সেই তফাতের জন্য ত্রিমাত্রিক বস্তুর বেলাতে অক্ষিপেটে গঠিত প্রতিবিম্ব একই রকমের হয় না। দুটি প্রতিবিম্ব সম্মিলিত হলেই বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপটি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা আসে।

প্রঃ। থিওরি অব রিলেটিভিটি কার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে ? গোপাল কর, পালপুর-চাকদহ, মালদহ।

উঃ। থিওরি অব রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ আইনস্টাইন প্রবর্তিত মতবাদ। মতবাদটি প্রধানতঃ দুটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তবে মতবাদ হলেও গাণিতিক সমাধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব পরীক্ষায় সর্বক্ষেত্রে নিভুর্ল প্রমাণিত।

সিদ্ধান্ত দুটির একটি হলো, কোন বস্তুর গতি কখনও অন্য নিরপেক্ষ হতে পারে না। অপরটি, স্থান ও কাল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তথা আপেক্ষিক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কখনও সম্ভব নয়।

প্রথম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন বস্তুর গতি অপর কোন স্থির বস্তুর সাপেক্ষে নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই স্থির নয়। গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সী সবই গতিশীল। এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও প্রসারিত হচ্ছে। অতএব স্থির বস্তু কোথায় যে তাকে নিয়ে কোন পদার্থের গতি নির্ধারণ করা যাবে ? অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব গতিই আপেক্ষিক।

দ্বিতীয় স্থান ও কালের কথায় যদি আসা যায়, তাহালেও দেখা যাবে এখানেও রয়েছে সেই অপেক্ষিকতা। যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুই ভ্রাম্যমান অবস্থায় ররেছে এবং মহাশূন্যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি পরিক্রমা করতে বাধ্য হচ্ছে, তাই তাদের প্রত্যেকেরই সময় অনুযায়ী অবস্থান এবং অবস্থান অনুযায়ী সময় হতে বাধ্য। এক কথায় বলা যায় গতিশীল বিশ্বে দেশ ও কালের মধ্যে "অ্যাবসল্যুট" কোন মাপই নেই—সবই একে অপরের অপেক্ষিক। আইনস্টাইনের মতে, নিত্যবস্তু কেবল আলো ও আলোর গতিবেগ। আলোর গতিই চরম গতিবেগ এবং আলোর গতিবেগ পার হতে পারলেই উল্টোকালে ফেরা সম্ভব। অর্থাৎ কাল হবে ঋণাত্মক।

প্রঃ। মহাজাগতিক রশ্মি কাকে বলে ? বিদ্রোহী দাস, গড়াপোতা, নদীয়া।

উঃ। মহাজাগতিক রশ্মি বা 'কসমিক রে' উচ্চ ভেদন শক্তি সম্পন্ন এবং উচ্চ কম্পনযুক্ত তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের মিশ্রণ, যা তড়িতাবিষ্ট কণিকার সমষ্টি। মহাশূন্য থেকে আগত এই রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসছে। এর প্রভাব সাগর তলায়ও দেখা যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে এর প্রভাব ক্রমান্বয়ে বেশী। শুধু পৃথিবী পৃষ্ঠে নয়, মহাশূন্যের চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরলের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে এই রশ্মি।

রশ্মিটির উৎস যে কোথায় এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টির মূলে ওর অবদান কতখানি— আজও তার সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে রশ্মিটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এরা ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত পারমাণবিক নিউক্লিয়াস দিয়ে গড়া। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করার পর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম কালে ঐ কণিকা-গুলোর সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্যাসের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংঘাত ঘটে। তাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের পজিট্রন মেসন প্রভৃতি কণার উদ্ভব হয়। অবশেষে ভূপৃষ্ঠে যারা পৌছায় তাদের প্রায় তিন চতুর্থাংশই মেসন কণিকা। মেসন কণিকারা আবার অত্যন্ত স্বল্পায়ু। ওদের $2{\cdot}15 \times 10^{-6}$ সেকেণ্ডের মত। মহাজাগতিক রশ্মি কণারা ভয়ানক উচ্চ শক্তি সম্পন্ন, প্রায় 10^{17} ইলেকট্রন ভোল্টের মত।

প্রঃ। রক্ত তঞ্চন কী ? এবং কীভাবে ঘটে ? রতন, শিবাজী, অখিল, প্রশান্ত-মহেন্তর, বর্ধমান।

উঃ। দেহের কোন অংশে রক্তনালীতে ক্ষত সৃষ্টি হলে অথবা কেটে গেলে, সেই পথে রক্ত রক্তনালীর বাইরে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাকে আমরা সাধরণতঃ রক্তক্ষরণ বলি। তবে দেখা গেছে, রক্তক্ষরণ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মাত্র তিন থেকে পাঁচ মিনিটের ভেতরেই স্বাভাবিক নিয়মে বেরিয়ে আসা রক্ত ক্ষতস্থানের কাছে জমাট বাঁধে এবং রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হওয়ার মূলে আছে, ক্ষতস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলের রক্তে অবস্থিত অনুচক্রিকা থেকে থ্রম্বো-প্লাস্টিন নির্গত হওয়া। ঐ থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তের প্রোথ্রম্বিন এবং ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় থ্রম্বিন গঠন করে। আর ঐ থ্রম্বিনই রক্ত মধ্যস্থ ফাইব্রিনোজেনের সহায়তার ফাইব্রিন বা জমাট রক্ত উৎপাদন করে। প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় রক্ত তঞ্চন।

তবে দেখা গেছে, হিমোফিলিয়া প্রভৃতি বংশগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহে রক্তক্ষরণ ঘটলে সহজে তঞ্চন হয়

না। তাঁদের রক্তের অনুচক্রিকা থেকে সহজে ছুম্বোপ্লাস্টিন নির্গত হয় না বলেই এমনটি ঘটে থাকে।

প্রঃ জল গরম করলে উপচে পড়ে না, কিন্তু দুধকে গরম করলে উপচে পড়ে কেন ? **প্রকাশ দাস, বাঙ্গালপুর-বাগনান হাওড়া।**

উঃ জল ও দুধ দুয়ের মধ্যে বাতাস কিছুটা দ্রবীভূত হয়। আবার গরম করার কালে উদ্ভব হয় জলীয় বাষ্প। তাপপ্রদানে ওদের দ্রুত প্রসারণ ঘটে। জলের ক্ষেত্রে প্রসারিত বাতাস ও জলীয় বাষ্প সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুধের বেলায় বাতাস এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্পের বুদবুদের উপর স্নেহজাতীয় উপাদানের একটা আবরণ তৈরি হয়ে যায়। ফলে ঐ বুদবুদগুলো সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং পারে না বলেই দুধ গরম করলে উথলে উঠে।

প্রঃ পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত কেমন করে হয়েছে ? **পূর্ণগোপাল মণ্ডল, কেদারপুর 24-পরগণা।** তোমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য জানুয়ারী-'89 সংখ্যাটি দেখ।

প্রঃ নারিকেল খাওয়া শরীরের পক্ষে কতখানি উপকারী ? **মিহিরকুমার রায়, বগুলা, নদীয়া।** [গত জানুয়ারী-'89 সংখ্যায় ডাবের খাদ্যগুণ প্রসঙ্গে "বলতে পারো কেন" বিভাগে লেখক ডাবের খাদ্যগুণ নারকেলের তুলনায় নিকৃষ্ট উল্লেখ করেছিলেন। আর সেই একই সংখ্যায় "সুস্মিত রায়ের" লেখা "ডাবের জল" প্রসঙ্গটিও আছে। তাই কোন কোন পাঠকের কাছ থেকে কিছু কিছু অভিযোগ এসেছে।

সুস্মিত বাবু ঠিকই বলেছেন। আর আমি বলেছি, নারকেলের তুলনায় ডাবের খাদ্যগুণ বিশেষ কিছু নেই বললেই হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ডাব খাওয়া পুষ্টিকর খাদ্যের অপচয়। তবে পানীয় হিসেবে ডাব ভাল—স্নিগ্ধ পানীয়।" সুযোগ আসায় দুটোর তুলনা তুলে ধরলাম এখানে।]

ডাবের জলে থাকে শতকরা 0·2 ভাগ প্রোটিন, 0·1 ভাগ স্নেহ, 5 ভাগ শর্করা, 0·4 ভাগ খনিজ লবন, প্রতি 100 গ্রাম ঝুনা নারকেলে থাকে 6·8 গ্রাম, প্রোটিন, 62·3 গ্রাম স্নেহ, 18·4 গ্রাম শর্করা, 2·7 মি·গ্রা লোহা, 400 মিগ্রা ক্যালসিয়াম 210 মিগ্রা ফসফরাস, 0·08 মি·গ্রা ভিটামিন B। 0·06 মি·গ্রা ভিটামিন B_2, 7 মিগ্রা ভিটামিন C। অথচ আদর্শ খাদ্য দুধের 100 গ্রামে এগুলি থাকে যথাক্রমে 3·2 গ্রাম, 4·1 গ্রাম, 4·4 গ্রাম, 0·2 মিগ্রা, 120 মিগ্রা, 90 মিগ্রা, ·051 মিগ্রা, ·06 মিগ্রা। মিগ্রা, অতিরিক্ত হিসেবে ভিটামিন A 102 A.V.। আজকের কীটনাশকের উপদ্রবের দিনে এমন একটি বিশুদ্ধ ও খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ খাদ্যকে মাত্র 25 গ্রাম খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করালে খুবই ভালো হয়।

জেনে রাখা ভাল

শালগ্রাম শিলা বা নারায়ণ শিলা

পূজা পদ্ধতি এবং যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দুদের নারায়ণ শিলা না হলে চলে না। পৌরাণিক কাহিনীতে উক্ত শিলার সঙ্গে সতী তুলসী, দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়, স্বয়ং নারায়ণ ইত্যাদি অনেকের নাম জড়িত। বলা হয়েছে, নারায়ণের ইচ্ছায় গণ্ডকী নদীতে বজ্রকীটের দ্বারা কর্তিত হয়ে উক্ত শিলার উদ্ভব হবে। সতী তুলসী গাছে পরিণত হবেন এবং ঐ শিলার মাথায় তুলসী পাতা স্থাপন করে পূজো করতে হবে।

গণ্ডকী (পুরাণে সদানীরা) নেপালের পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত ছোট ছোট কয়েকটি ধারা, শোনপুরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং ঐসব জায়গায় সত্যিই শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। তবে বজ্রকীট নামে কোন কীট নেই এবং কোনও কীটের দ্বারা কর্তিত নয়। এটি অতীতের মোলাস্কা পর্বভুক্ত লুপ্ত অ্যামোনাইটের জীবাশ্ম।

অ্যামোনাইট ছিল আজকের নটিলাস, স্কুইড, শঙ্খ প্রভৃতির জ্ঞাতি ভাই। জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে পেট্রিফিকেশন পদ্ধতিতে। আজ থেকে প্রায় 23 কোটি বছর আগে আদিম স্থলভাগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মাঝখানে যে টেথিস সাগরের উদ্ভব হয়েছিল সেইখানে এরা এসেছিল প্রচুর পরিমাণে। কালক্রমে ওরা লুপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের কিছু কিছু মৃতদেহ কোমল পলিমাটির স্তরে আটকা পড়ে। তারপর যুগের পর যুগ ধরে তাদের দেহের উপর সঞ্চিত হয়েছে পলিমাটি। ব্যাকটিরিয়াদের দ্বারা অথবা স্বাভাবিক কারণে উপরের শক্ত আবরণে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। জলের সঙ্গে মিশ্রিত নানাবিধ খনিজ, রাসায়নিক পদার্থ, বালি প্রভৃতি অতি মন্থর গতিতে কণায় কণায় সঞ্চিত হয়েছে। ফলে মূল জীবটির সব কিছু বিনষ্ট হয়ে গেছে আর তার স্থান দখল করেছে সিলিকা এবং রূপান্তরিত হয়েছে সম্পূর্ণ অজৈব এক শিলায়।

হিমালয়ের আশে পাশে ওকে পাওয়ার কারণ, পূর্ববর্তী টেথিস সাগর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেছে ভঙ্গিল পর্বত হিমালয়। যেহেতু মহীচলনের দরুন তলার পলির মধ্যে ভাঁজ পড়ে হিমালয়ের জন্ম, অ্যামোনাইটদের কিছু কিছু জীবাশ্ম পলির সঙ্গে উঠে এসেছে এবং স্থান নিয়েছে হিমালয়ের শীর্ষে।

তবে মনে হচ্ছে, নারায়ণ শিলা যে শঙ্খের জাত ভাই এই তত্ত্বটি প্রাচীন ভারত হয়ত কোন কারণে জানতে পেরেছিল। পরে ওকে ঘিরে নানা কাহিনী পল্লবিত হয়েছে এবং নানা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

এপ্রিল '88 থেকে মার্চ '89 পর্যন্ত কুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট প্রভৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল জুন '88 থেকে মে '89 পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সুপার কুইজ কনটেস্ট ও সুপার আই কিউ টেস্ট প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ডিসেম্বর '88 সংখ্যায়। এবার তা হবে ডিসেম্বর '89 সংখ্যায়।

গত এক বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের কাছে পুরস্কার ও উপহারের কুপন পাঠানো হয়েছে। (এই বিষয়ে গত মে '89 সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে) যারা এখনও চিঠিসহ কুপন পাওনি বা চিঠি পেয়ে পুরস্কার পাওনি তাদের অবিলম্বে দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। 'বুদ্ধিশুদ্ধি' প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের গত জানুয়ারি '88 থেকে পত্রিকা পাঠানো হচ্ছে।

এবার থেকে প্রতি মাসেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের উপহার ও পুরস্কারের কুপন বাড়ির ঠিকানায় পাঠানো হবে এবং প্রাপকদের দপ্তর থেকে পুরস্কার ও উপহার গ্রহণ করতে হবে। 10 জুন এর মধ্যে যোগাযোগ না করলে প্রাপকদের সাধারণ ডাকে পুরস্কার ও উপহার পাঠানো হবে। যারা রেজিস্টার্ড ডাকে পেতে ইচ্ছুক তাদের আলাদা ডাক ব্যয় বহন করতে হবে। —পরিচালক

সফল উত্তরদাতাদের নাম

মে '89-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **অরিন্দম চন্দ্র,** ফ্ল্যাট নং—B/2, ক্লাস্টার XI পূর্বাচল, সেক্টর-3, সল্টলেক কলকাতা-700 091 2 **প্রদীপ পাল,** প্রযত্নে, যাদবচন্দ্র পাল, চুঁয়াপুর, পোস্ট—বহরমপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পিন-742 101 3. **শুভাশিষ বিশ্বাস,** বগুলা কলেজপাড়া, পোস্ট—বগুলা, জেলা—নদীয়া, পিন-741 502 4. **মিঠু ঘোষ,** গ্রাম—মাখালিয়া, পোস্ট—বাখরাহাট, জেলা—24-পরগনা (দঃ), পিন-743377 5. **শিবানী ভৌমিক,** প্রযত্নে, পি. কে. ভৌমিক, 147/A, কইজার স্ট্রীট, কলকাতা-700-009 6. **সৌরভ রায়,** প্রযত্নে, এস. এন. রায়, 3H/2, unit-6 গোল বাজার, পোস্ট—খড়্গপুর, জেলা—মেদিনীপুর 7. **মনোজ আঢ্য,** প্রযত্নে, বিষ্ণুপদ আঢ্য, গ্রাম+পোস্ট—ধনতিয়া, ভায়া—বসিরহাট, জেলা - উত্তর 24 পরগনা, পিন - 743 411 8. **দেবায়ন চন্দ্র,** প্রযত্নে, গৌরহরি দাস, লালকুঠি পাড়া, পোস্ট—সিউড়ি, জেলা—বীরভূম, পিন-731 101 9, **অনেক চক্রবর্তী,** প্রযত্নে, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, ডাঙ্গালপাড়া, পোস্ট—সিউড়ি, জেলা—বীরভূম, পিন-731 101 10. **শমীক নাগ,** D/11/4/2, পি. অ্যাণ্ড টি কোঃ, সি. সি ব্লক, সল্টলেক সিটি কলকাতা

মে '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-I-এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1. **পত্রলেখা মুখার্জী,** (এগারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, মুক্তি মুখার্জী স্কুলডাঙ্গা, পোস্ট—বাঁকুড়া, জেলা—বাঁকুড়া।

2 **দেবাশিস মাজি,** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, অনাথবন্ধু মাজি, কোঃ নং-B 131/6, পোস্ট—কে. টি. পি, পি. টাউনশিপ, জেলা—মেদিনীপুর, পিন-421 171।

3. **দেবাদিত্য ঘোষ,** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 17, ইনসিনেরেটর রোড, কলিকাতা-700 028।

মে '89-এ প্রকাশিত কুইজ কনটেস্ট গ্রেড-II এর সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কার পাবে :

1 **হিমাচল মুখার্জী,** (এগারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, **চণ্ডীদাস মুখার্জী,** স্কুলডাঙ্গা, পোস্ট—বাঁকুড়া, জেলা—বাঁকুড়া।

2. **ধীমান বসু,** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) 38/1, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা-700 008।

3. **পিনাকী দত্ত,** (দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর) প্রযত্নে, নিখিল কুমার দত্ত, 47, বড়জোনপুর, পোস্ট—কাঁচরাপাড়া, জেলা—24-পরগনা (উঃ)

বি. দ্র. ● মে '89-এ প্রকাশিত কুইজ-কনটেস্ট গ্রেড-III-এর উত্তর প্রদান আশানুরূপ না হওয়ায় কোন নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

নিজে নিজে কর

ইলেকট্রনিক গেম দীপেন ভট্টাচার্য

ভাইপো উদয় সবে মাত্র Relay (রিলে) তৈরি করা শিখেছে। কিন্তু বায়না ধরল Relay দিয়ে তৈরি কোন মজার খেলনা তৈরি করবে সে। এখন ও যা কিছু জানে তার মধ্যে কি Circuit করে দেওয়া যায়! হঠাৎ Circuit তৈরীর পুরানো ডায়রীতে এইটা বেরিয়ে পড়ল। দুটো Relay ছাড়া দুটো Switch (সুইচ্) আর দুটো L.E.D. ওকে দিয়ে দিলাম। তারপর Circuit দেখে ছোট্ট ব্যাটারির বাক্সে খুব সুন্দরভাবে তৈরী করে ফেলল মডেলটা। —আর এখনও পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ছোট্ট ভাইপো তন্ময়ের সঙ্গে দেখি দিব্বি ওটা নিয়ে খেলা করছে। তোমরা যারা Relay তৈরি করতে পার, তারা মাত্র ছয়-সাত টাকায় এই মজার মডেলটা করতে পার। এই Circuit-এ S_1, S_2 Off অবস্থায় AB ও CD সংযুক্ত থাকে। এখন S_1 on করলে Relay Rl_1 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহ যায়, D_1 জ্বলে ওঠে ফলে A-B বিচ্ছিন্ন হয় এবং S_2 on করলেও তখন D_2 জ্বলে না কারণ D_2-এর বর্তনী A.B.-এর মধ্য দিয়ে গেছে। অনুরূপে S_1 off অবস্থায় S_2 on করলে D_2 জ্বলে থাকে S_1 কে পরে on করলে

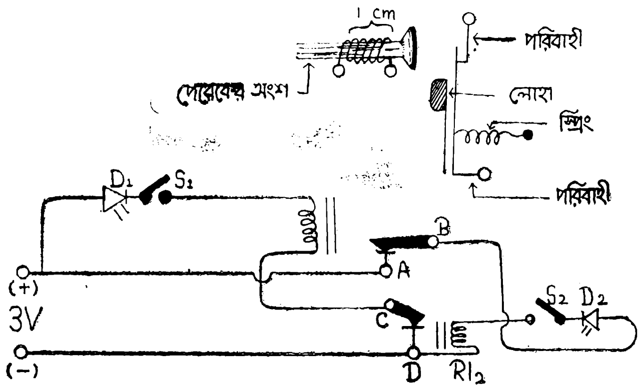

আর জ্বলে না। তাই এটা দিয়ে কে আগে Switch চাপতে পারে তা নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করা যায়।

এবার তৈরী করে ফেলে তোমার কোন বন্ধুকে বল S_2 Switch-এ হাত দিতে আর তুমি S_1 ধর। One-two-three বলে দুজনেই চাপ দাও। যে আগে চাপতে পারবে তার দিকের L.E.D. জ্বলে থাকবে এবং সে জয়ী হবে।

Components

1. দুইটি Relay 6 Volt-এর Relay-এর Spring ঢিলে করে 3 Volt-এর করে নিতে পার। কেউ ইচ্ছে করলে ছবি অনুযায়ী সরু ইন্সুলেটার তার (চারশো পাকের মত) জড়িয়ে তৈরী করে নিতে পার। Radio-এর দোকান থেকে খারাপ OSC. Coil বা Transformer-এর তার (সরু) দিয়ে করতে পার। (Relay-One way হলেই চলবে)। 2. দুইটি Switch। 3. দুইটি L.E.D (লাল ও সবুজ নিতে পার)

দীপেন ভট্টাচার্য, রমাকান্ত ইলেকট্রনিক্স, তালদি, 24-পঃ।

ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড—I II III-এর উপহার

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

জুলাই '89 সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড-1 সমরজিৎ করের পরমাণু গবেষণায় ভারত

গ্রেড-2 অমরনাথ রায়ের আরও সায়েন্স ক্যুইজ

গ্রেড-3 পার্থ চক্রবর্তীর বুদ্ধি নিয়ে খেলা

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টে উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..............................

....

বাড়ির ঠিকানা......................

....

বয়স................ শ্রেণী ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এর উত্তর পাঠালাম।

হিমায়ন যন্ত্র

সৌমেন বিশ্বাস

বেশ গরম পড়ছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে তেষ্টা মেটাতে কে না চায় একটু ঠাণ্ডা জল। ফ্রীজের জল। না, ফ্রীজ কেনা তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এসো আমরা একটি মিনি ফ্রীজ তৈরী করি। নিজের হাতে তৈরি ফ্রীজের ঠাণ্ডা জল খাওয়া কম আনন্দের কথা নয়। এর জন্য কিন্তু বিদ্যুৎ লাগে না। আর খরচও খুব কম। এটা তৈরি করতে লাগবে,—একটি চোঙাকৃতি ধাতব পাত্র, একটি মাটির জালা, একটি ট্যাপকল, বালি, থার্মোকল এবং সংযুক্ত অংশগুলো জল নিরোধক করার জন্যে পুডিং। জালার মুখের ব্যাস ও ধাতব পাত্রের ব্যাস সমান হওয়া প্রয়োজন। এবারে "ক" ছবি অনুযায়ী ফ্রীজ তৈরি করো। ঠাণ্ডা করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান জল সামান্য উঁচুতে অবস্থিত একটি জলাধার থেকে রবার নলের মাধ্যমে জালা ও পাত্রের মধ্যবর্তী বালির স্তরে পাঠানো হয়। জলাধারটি তাপ-নিরোধক হলে ভালো হয়।

এখানে উল্লেখ্য, যদিও কুঁজোর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, তথাপি এই প্রযুক্তি অধিকতর সুবিধাযুক্ত। এই পদ্ধতিতে ঘরের তাপমাত্রার অনেক নীচের তাপমাত্রা পাওয়া যায়। বালি ব্যবহার করায় দ্রুত শীতল হয় এবং জালার জল শুকিয়ে গেলেও নিম্ন তাপমাত্রা স্থায়িত্ব লাভ করে। আলাদা ধাতব পাত্র ব্যবহার করায় তাপ হ্রাসে বাধা সৃষ্টি করে না। জল বা পানীয় ছাড়াও অন্যান্য খাবার, ফলমূল, সবজী সংরক্ষণ করা যায়। জল বা পানীয় বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত রাখে। দূষিত বায়ু ও জলের সংস্পর্শে আসার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পাণীয় ও জলের অপচয় রোধ করে। ট্যাপকল ব্যবহার করায় অল্প আয়াসে প্রয়োজন মতো জল বা পানীয় বের করা যায়।

যে সব বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে—(i) ধাতব পাত্রের তাপ পরিবাহিতা, (ii) বালির স্তর, (iii) মাটির জালার সচ্ছিদ্রতা, এবং (iv) জলাধারের জলের ও ঘরের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশী হবে তত নিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া যাবে।

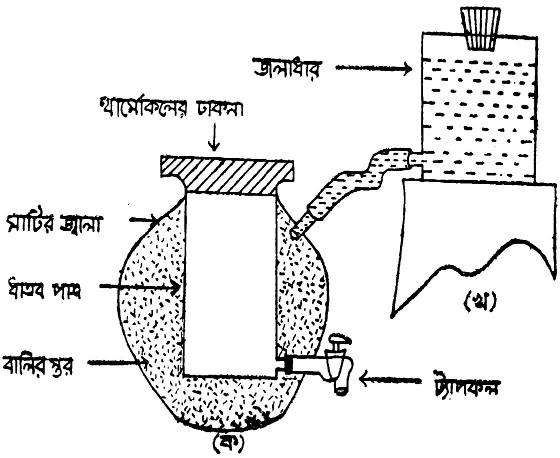

কিভাবে ফ্রীজের তাপমাত্রা নির্ণয় করবে? থার্মোকলের ঢাকনায় একটি সরু ছিদ্র করে একটি থার্মোমিটারের পারদ কুণ্ডটি ধাতব পাত্রের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দাও। সমস্ত ব্যবস্থাপনা যেন বায়ুনিরুদ্ধ হয়। প্রথমে পারদ স্তম্ভকে ঘরের তাপমাত্রায় আসতে দাও। তারপর থার্মোমিটারটি সঠিকভাবে স্থাপন করে 10-15 মিনিট অন্তর পাঠ নাও।

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, 11/3A কে, কে, ব্যানার্জী রোড, বহরমপুর—742101.

মডেল নির্মাতাদের প্রতি

ঘোষণা

মডেল নির্মাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে—এবার থেকে তাঁরা যেন রচনার শেষে অবশ্যই স্বীকৃতি হিসেবে নিম্নোক্ত ঘোষণাটি করেন ঃ

আমি (পুরো নাম ও ঠিকানা)..

নিজে এই মডেলটি, আমার রচনা ও সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী তৈরি করে সাফল্য অর্জন করেছি।

স্বাক্ষর..............................

'বিজ্ঞান সাধক' গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অষ্টম বার্ষিক স্মরণসভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি (৪ই এপ্রিল 89) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে ডঃ জয়ন্ত বসুর সভাপতিত্ব ও খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর প্রধান আতিথ্যে ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অষ্টম বার্ষিক স্মরন সভা হয়।

শর্মিলা গুপ্তর সঙ্গীতের পর গোপাল চন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মালা দেওয়া হয়। এরপর বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন—গোপালচন্দ্র তাঁর কৌতুহলী চোখে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবার সময়েই প্রকৃতির নানা রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই রহস্য উদঘাটন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি তা সাধারণের কাছে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখে-গেছেন। নিজের জীবনে তিনি বিজ্ঞান সাধনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো একজন শান্ত তপস্বী। সভায় অধ্যাপক হরিপ্রসাস সেনগুপ্ত; অধ্যাপক প্রবীর মুখোপাধ্যায় এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সম্পাদক ডাঃ অনিল বরণ দাস বক্তৃতা দেন। সভা শেষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ দেন। এবং শ্রীতুষার কান্তি দত্ত রঙীন স্লাইড সহযোগে 'গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি, বক্তৃতা দেন। প্রতিবেদক কালীকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলাদেশে

শরীয়তপুর (বাংলাদেশ): বিগত ৪ই এপ্রিল শনিবার সুবিখ্যাত প্রকৃতি-বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-এর ৪ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞানীর নিজ গ্রামের লোনসিং উচ্চবিদ্যালয়ে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভা-পতিত্ব করেন লোনসিং উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এ, এফ, এম, সাইদ। বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের বিচিত্র দিক দিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন শরীয়তপুর সরকারী কলেজের প্রভাষক জনাব এম, এ, আজিজ মিয়া। লোনসিং গ্রামে বিজ্ঞানীর বাল্যজীবন লোনসিং স্কুলের শিক্ষাজীবন এবং এখানকার—শিক্ষক জীবনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন লোনসিং স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক বাবু দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য, সহকারী শিক্ষক জনাব আনোয়ার হোসেন, নরিয়া সরকারী কলেজে প্রদর্শক বাবু দুলাল দাস। বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার বেছে কিছুটা অংশ পাঠ করে শোনায় ছাত্র গোলাম রব্বানী। সভাপতির ভাষণে জনাব সাঈদ বলেন, এমনি একজন প্রতিথযশা বিজ্ঞানী আমাদের গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেছেন, আমাদের স্কুলে লেখাপড়া করেছেন এবং শিক্ষকতা করেছেন এটা আমাদের গর্ব।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

গত 8 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে হাওড়া সার্বিক গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনত সম্পর্কে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনার বিষয়বস্তু—আদর্শ গ্রামীন পরিবেশ এবং আমরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ডঃ অরবিন্দ ঘোষ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন শ্রী সমরজিৎ কর।

কলিকাতা বাঁচাও

গত জুন মাসের তিন তারিখে বিড়লা ইণ্ডাসট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের উদ্যোগে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল 'Save Wetland—Save Calcutta', আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ডঃ দিলীপ কুমার সিন্হা। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের ফলে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিজ্ঞান সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ কোর্স

ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি কমিউনিকেশনের সহযোগিতায় আগামী 16ই জুন, 1989 থেকে 31শে জুলাই পর্যন্ত দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজী সেমিনার হলে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা ও গণ মাধ্যমের ব্যবহার সংক্রান্ত কোর্সটি অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন পত্র পাঠাতে পারেন, সম্পাদক "দ্যা সায়েন্স অ্যাসো-সিয়েসন অফ বেঙ্গল", 104 ডায়মণ্ড হারবার রোড' কলি-700008।

বিজ্ঞান রচনায় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার লেখক এবং একাধিক কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ প্রণেতা খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক ডঃ পার্থ সারথী চক্রবর্তী 1989 সালের জন্য প্রদত্ত শিশু-সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর লেখা **"মজার খেলায় বিজ্ঞান"** গ্রন্থটির জন্য। আমরা এজন্য পার্থ সারথী বাবুকে অভিনন্দন জানাই।

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যে বইয়ের প্রয়োজন ফুরোয় না।

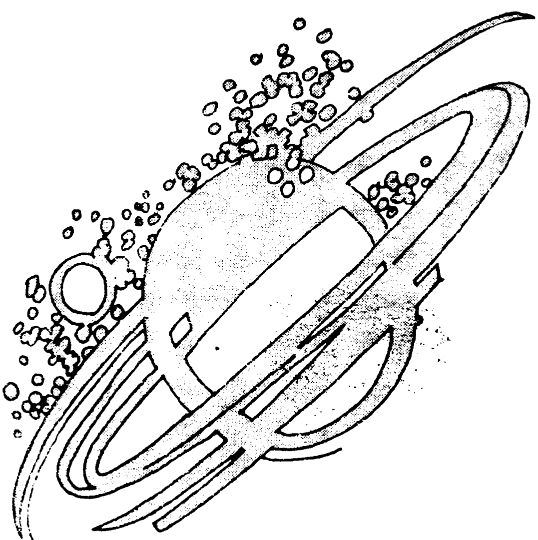

পুজো সংখ্যায় নির্বাচিত

প্রবন্ধগুচ্ছ : বিপন্ন প্রাণিজগত

লিখবেন : নারায়ণ সান্যাল ।। রতনলাল ব্রহ্মচারী ।। অজয় হোম ।। তারক মোহন দাস ।। সুবীর দত্ত ও অনেকে

বিশ্বখ্যাত লেখকের দুটি সায়েন্স ফিকশান অনুবাদ করবেন

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ও সৌরেণ ভট্টাচার্য

দশটি দুর্দ্ধর্ষ মজার এক্সপেরিমেন্ট উপহার দেবেন

সন্তোষ মিত্র ।। সমীর কুমার ঘোষ ।। অপরাজিত বসু ।। অমরনাথ রায় ।। দিবাকর সেন ও আরও অনেকে

দিলীপ দাস ও গৌতম কর্মকারের দীর্ঘ চিত্র কাহিনীর সঙ্গে থাকছে—রেবতীভূষণ ও শৈল চক্রবর্ত্তীর কার্টুন

এছাড়া, সুপার ক্যুইজ, আই কিউ টেস্ট, বুদ্ধিশুদ্ধি প্রতিযোগিতা তো থাকছেই—সেই সঙ্গে থাকছে অসংখ্য পুরস্কার।

প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

বেরুবে পুজোর আগেই

R/NO 37390/81 KISHORE JNAN BIJNAN Regd. No. WBEC 316 July '89 9th yr VOL 4

উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রাস
পরীক্ষার্থীদের জন্য

রতন মোহন খাঁ
আরও গণিত ক্যুইজ
সমীরকুমার ঘোষ
আরও ফিজিক্স ক্যুইজ
অমরনাথ রায়
আরও সায়েন্স ক্যুইজ
তারকমোহন দাসও
অসিত কুমার দাস
আরও বায়োলজি ক্যুইজ

প্রতিটি দশ টাকা

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯